গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

প্রণীত

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ।
২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা।

মূল্য—আট আনা

প্রিণ্টার—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত
"নলিনী-প্রেস"
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সূচীপত্র

গোবিন্দদাসের করচা-রহস্য

আরম্ভ

শান্তিপুরনিবাসী ও স্থানীয় মিউনিসিপাল হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় "গোবিন্দদাসের করচা" নামক একখানি কবিতা পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারীর অধ্যক্ষদিগকে প্রকাশের জন্য প্রদান করেন। এই পুস্তক তাঁহাদিগের দ্বারা ১৮৯৫ সালে মুদ্রিত হয়। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, গোস্বামী মহাশয় ইহার একখানি সমালোচনার্থে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে প্রদান করেন। স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় ইহার একটী বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া ঐ সনের কার্ত্তিক মাসের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

মতিবাবুর অভিমত

মতিবাবু প্রথমে এই পুস্তকের সরল ভাষার, সুন্দর কবিতার এবং চমৎকার বর্ণনার অশেষ প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলেন—

"শ্রীল জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দদাসের করচা নামক যে পুস্তক ছাপিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ যে অলীক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অলীক অংশ গোড়ার ৫০ পাতা। যেরূপে এই অলীক অংশ ছাপার

পুস্তকে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বলিতেছি। এই করচার সমগ্র হস্তলিখিত পুথি কেবলমাত্র শ্রীল জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল। উহার প্রথম হইতে রায় রামানন্দের সহিত মিলন পর্য্যন্ত অংশ রাণাঘাটের বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমার অগ্রজ পূজ্যপাদ শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে অর্পণ করেন। তিনি ঐ পাতাগুলি পাইবামাত্র পাঠ করেন এবং ইহা পাঠে এ প বিমোহিত হন যে, বারম্বার পাঠ করিয়া উহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কাহিনী সমূহ একরূপ কণ্ঠস্থ করেন এবং শেষে এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লিখেন। হস্তলিখিত পাতাগুলি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ফেরত দেওয়া হয়, এবং আমাদের যতদূর স্মরণ আছে তিনি উহা "রেইস্ ও রায়ত" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে উহা ফেরত পাওয়া যায় না। এইরূপে আদিম করচার গোড়ার পাতাগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

"এই ঘটনার পর গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার অগ্রজ মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনি করচার অবশিষ্টাংশ—অর্থাৎ রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হইতে শেষ পর্য্যন্ত—অগ্রজ মহাশয়কে অর্পণ করেন। তিনি এই অংশ অবিলম্বে নকল করিয়া রাখেন। [এই নকল খাতা অদ্যাপি আমাদের ঘরে আছে।]

"যে পাতাগুলি হারাইয়া যায়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয় এবং উভয়ই সে জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে তাঁহারা আশা করেন যে, এই নষ্ট অংশ কাহারও না কাহারও হস্তগত হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ উহা নকল করিয়া রাখিতে পারেন। সুতরাং এইরূপে উহা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারিবে। গোস্বামী মহাশয় এরূপ আশাও করিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহাদের ঘরে এই গ্রন্থ রহিয়াছে,

তখন উহার নকল কোন আখড়া বা বৈষ্ণব-গৃহে থাকিবার সম্ভাবনা। যাহাহোক শেষে এইরূপ সাব্যস্ত হয় যে, করচাখানি ছাপান কর্ত্তব্য। তবে নষ্ট পাতাগুলি পাওয়া যায় ভালই, নচেৎ উহা বাদ দিয়াই ছাপা হইবে। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ ঐ অংশে যে সকল প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ ছিল তাহা অগ্রজ মহাশয়ের কণ্ঠস্থ আছে এবং উহার কতকগুলি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ও শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"গোবিন্দদাসের করচা ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়া গোস্বামী মহাশয় একদিন আমাদিগকে দর্শন দিয়া বলেন যে, হারাণো কয়েকটি পাতার নকল তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ঠিক বলিতে পারেন না ঐ নকল অংশ অলীক কি না। তবে তাঁহার বাসনা, গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত না হয়। এই নিমিত্ত তিনি ঐ নকল অংশ সহ পুস্তকখানি ছাপিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, নকলটি যদি প্রকৃতই অলীক হয় তবে উহা প্রকাশিত হইলে কোন না কোন ব্যক্তি এই ভুল ধরিয়া দিবেন, এবং এইরূপে আসলটুকু হয়ত বাহির হইয়া পড়িবে। এই প্রকারে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ঐ নকল অংশের স্থান দেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ঐ নকল অংশ সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের উদ্দেশ্য ত সুসিদ্ধ হয়ই নাই, অধিকন্তু ঐ নকল অংশ ছাপার পুস্তকে প্রকাশিত হওয়ায় সমস্ত করচাখানি অবিশ্বাস্য হইবার সম্ভবনা হইয়াছে।"

ইহার পর পাণ্ডুলিপির নষ্টপত্র গুলির সহিত মুদ্রিত পুস্তকের ঐ অংশের যে সকল স্থানে মিল নাই সমালোচক মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। সেই গুলি আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

(ক) নষ্টপাতা গুলিতে ছিল—গোবিন্দ কায়স্থ, বেশ লিখিতে

পারিতেন, সংস্কৃত ভাষায় তাহার বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু মুদ্রিত-পুস্তকে আছে,—তিনি কর্ম্মকার, হাতাবেড়ি গড়া তাহার জাত-ব্যবসা।

(খ) নষ্টপাতায় ছিল—গোবিন্দের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তাহার পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্রী হন। একে গৃহশূন্য হওয়ায় তিনি সংসারে আর সুখ পান না, তাহার উপর পুত্রবধূ তাঁহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। পুত্রকে জানাইয়া কোন ফল না হওয়ায় গোবিন্দ সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আছে—গোবিন্দের স্ত্রী শশীমুখী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহাকে নির্গুণ মূর্খ বলিয়া গালি দেন, এবং সেই অপমানে গোবিন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

(গ) নষ্টপাতা গুলিতে এক রজকের কাহিনী ছিল। গোবিন্দের করচা মুদ্রিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে শিশিরবাবু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "প্রভু ও রজক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে আছে—"শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন নীলাচল অভিমুখে চলিলেন, তখন তিনি অসীম শক্তির সহায়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। কারণ তখন দ্রুতগতিতে কার্য্য না করিলে চলে না। এইস্থানে এই সময়কার একটি কাহিনী বলিব। এটী গোবিন্দ তাঁহার করচায় বলিয়াছেন। এই গোবিন্দ প্রভুর ভৃত্য, তিনি নীল্যাচলে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া মহাত্মা শিশিরকুমার করচা হইতে রজকের কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ছাপার করচায় এই রজকের কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই।

এতদ্ভিন্ন করচায় এরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা অপর কোন গ্রন্থে নাই। যেমন—

করচায় আছে—সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু শান্তিপুর হইয়া বর্দ্ধমানে গেলেন। তারপর দামোদর পার হইয়া হাজিপুর, নারায়ণগড়, জলেশ্বর,

প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া সুবর্ণরেখার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন—ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর ও গোবিন্দ। কিন্তু শান্তিপুর হইতে বাহির হইবার পর হইতে পুরী পৌছান পর্য্যন্ত সঙ্গীদিগের মধ্যে একমাত্র গোবিন্দ ভিন্ন অপর কাহারও নামের উল্লেখ করচায় নাই।

করচায় আছে—প্রভু বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের পথে পুরী গিয়াছিলেন। প্রভুর এই পুরীযাত্রা কাহিনী এবং সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার সঙ্গীদিগের চরিত্র করচায় কি ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, এখন তাহাই দেখাইতেছি। গোবিন্দ কর্ম্মকার করচায় বলিতেছেন—

"বর্দ্ধমানে যখন পৌছিনু মোরা সবে।
ভাবিতে লাগিনু মুহি ভাগ্যে কিবা হবে॥
তখন—মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে।
চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে॥
এই কথা শুনি মুহি উঠিনু চমকি।
হাসিয়া চলিল প্রভু ঠমকি ঠমকি॥"

এখানে একটি কথা ভাবিবার আছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ভাবে বিভোর হইলেন এবং কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। নিত্যানন্দ অনেক কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহে লইয়া আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া এবং জননী ও ভক্তগণকে কৃপা করিয়া প্রভু একদিন হঠাৎ তথা হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন প্রভুর মনের ভাব এইরূপ, তখন তিনি নীলাচলের পথ ছাড়িয়া কাঞ্চননগরে গোবিন্দের গৃহে চলিলেন, এবং কি ভাবে চলিলেন তাহা করচা হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত পয়ারগুলিতে প্রকাশ। এইরূপে প্রভুর চরিত্র সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকার প্রভুর প্রতি পাঠকের

ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিলেন, না তাঁহার প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিলেন?—ইহাই এখন ভাবিবার বিষয়।

তারপর শুনুন। প্রভু গোবিন্দের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতে করিতে "ঠমকি ঠমকি" চলিয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দের স্ত্রী শশিমুখী হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর স্বামীকে দেখিয়া—

"কাঁদিয়া আকুল বামা চারিদিকে চায়।
তখন—তত্ত্বকথা বলি প্রভু তাহারে বুঝায়॥"

আমরা প্রভুর লীলাগ্রন্থে দেখিতে পাই, প্রভু যখনই যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রূপ, সনাতন, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নাম কে না জানেন? সেই প্রভুকে শশিমুখীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল! প্রভু নানাপ্রকার তত্ত্বকথা বলিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সকল উপদেশ শশিমুখীর হৃদয় স্পর্শ করিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া—

"প্রভু কহে—গোবিন্দ রে গৃহে থাক তুমি।
অন্য ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি॥"

অর্থাৎ প্রভু যখন দেখিলেন যে, শশিমুখী কিছুতেই নিরস্ত হইল না, সে গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়া লইয়া যাইয়া তাহাকে আবার পচাগৃহস্থ না সাজাইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন প্রভু আর কি করেন? তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া গোবিন্দকে বলিলেন,—"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। কাজেই তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" এই কথা বলিয়া ও শশিমুখীর হাতে গোবিন্দকে সঁপিয়া দিয়া, প্রভু সেই স্থান হইতে সরিয়া

পড়িলেন। প্রভুর অনেক পথ যাইতে হইবে, কাজেই একজন ভৃত্যের আবশ্যক ত বটেই, নচেৎ দণ্ডকমণ্ডলু বহির্বাসাদি বহিয়া লইয়া কে যাইবে। করচা-লেখক এইভাবে প্রভুর মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। যিনি দক্ষিণদেশে যাইবার সময় প্রথমে কোন লোক সঙ্গে লইতেই রাজী হন নাই, তিনিই বলিতেছেন,—"গোবিন্দ ঘরে যাও, আমি না হয় অন্য ভৃত্য সঙ্গে লইয়া যাইব।" এই কথা যিনি প্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিলেন, তিনি কি না হইলেন প্রভুগত-প্রাণ! করচা-লেখক হয় ত তখন গোঁসাঞী ঠাকুরের ভৃত্যসঙ্গে প্রবাসে যাইবার কথা ভাবিতেছিলেন।

যাহাহৌক প্রভু ত সরিয়া পড়িলেন। তখন গোবিন্দ নিরুপায় হইয়া ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই সময় এক অঘটন ঘটিয়া গেল,—সেই হাতাবেড়ি গড়া মূর্খ গোবিন্দকামারের মুখ দিয়া হঠাৎ নিগূঢ় তত্ত্বকথা অনর্গল বাহির হইতে লাগিল! আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রভুর তত্ত্বকথা যে শশিমুখীর মনের উপর কোনরূপ চাপ দিতে পারে নাই, গোবিন্দকামারের বদননিঃসৃত তত্ত্বকথা কেবলমাত্র সেই শশিমুখীকেই নহে, উপস্থিত সকলকেই এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, গোবিন্দ তখন অবলীলাক্রমে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন,—কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না! তখন তিনি দ্রুতপদে দামোদরের তীরে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

গোবিন্দের এই কার্য্য যে এক অলৌকিক ব্যাপার তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; এবং দীনেশবাবু যদিও বলিয়াছেন যে, "এ সকল অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা ভাবরাজ্যের কথা", তবুও এই অলৌকিক ঘটনা যখন গোবিন্দদাসের করচায় প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ইহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় নাই।

যাহাহৌক ক্রমে দামোদর পার হইয়া তাঁহারা কাশীমিত্রের বাড়ী

উপস্থিত হইলেন। কাশীমিত্র অত্যন্ত ধার্ম্মিক লোক। অতিথি সন্ন্যাসী দেখিয়াই তিনি ভোগ লাগাইবার জন্য ভাল সরু চাউল আনাইয়া দিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই চিকনিয়া চাউলের নাম কি ?" মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"জগন্নাথভোগ।" চাউলের নাম শুনিয়াই প্রভুর দুই চক্ষু দিয়া অজস্র প্রেমধারা বহিতে লাগিল। তখন প্রভু—

"কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—হা হা জগন্নাথ।
শীঘ্র টানিয়া মোরে লহ তব সাথ॥"

কিন্তু প্রভুর এই ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, তখনই তাঁহাকে ইহা সম্বরণ করিতে হইল। কারণ তিনি দেখিলেন যে, গোবিন্দ ক্ষুধার জ্বালায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিলেন, এবং পাকা পাচকের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শুক্তার ঝোল, বেতো শাকের সুপ, গুড় দিয়া চুকাম্ল, করলা ভাজা প্রভৃতি বিবিধ ব্যঞ্জন পাকাইলেন। গোবিন্দ বলিতেছে—

"বেতো শাকের গন্ধে দিক আমোদ করিল।
ভোগ না হইতে মন চঞ্চল হইল॥"

গোবিন্দের ভাবগতিক দেখিয়া প্রভু মধুর ভাষে তাহাকে বলিলেন—

"বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার।
ইতিউতি চাহিতেছ তাই শত বার॥

তারপর—প্রভু কহে তুলসী আনহ শীঘ্র করি।
ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ দিব প্রাণভরি॥"

গোবিন্দের আর সবুর সহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি পাতা পাতিয়া বসিলেন।

আর প্রভু—"ভোগ দিয়া প্রসাদ বণ্টন করি দিলা।

হুঙ্কার ঝোলে প্রাণ প্রসন্ন হইল॥

আটখানা কয়লার ভাজি খাই সুখে।

বড় বড় গেরাস তুলিয়া দেই মুখে॥

চুকায় গুড় দিয়া অমৃত সমান।

কত খাব, আনন্দেতে প্রসন্ন বয়ান॥"

এই বর্ণনা দ্বারা বেশ বোঝা যাইতেছে, গোবিন্দ কি জন্য প্রভুর এরূপ অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। যাহাহৌক প্রভু প্রথমে গোবিন্দের পেটের জ্বালা জুড়াইয়া তারপর নিজে ধীরে সুস্থে সেবায় বসিলেন, অথবা গোবিন্দের সঙ্গেই একত্রে বসিয়া গেলেন, সে সংবাদটি গোবিন্দ দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিম্বা লজ্জার খাতিরে ইচ্ছা করিয়াই দেন নাই, তাহা বলা বড় সহজ নহে। যাহাহৌক আহারাদির পরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন সময়ে গোরাচাঁদ দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা হাজিপুরে যাইয়া পৌঁছিলেন এবং গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষতলে যাইয়া বসিলেন। বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন সুরু হইল। হরিধ্বনি শুনিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে বহু নরনারী ও বালকবালিকার আগমনে সেই স্থান ভরিয়া গেল। তখন—

"নাচিতে লাগিলা প্রভু মাতাইয়া দেশ।

কোথায় কৌপীন ডোর আলুথালু বেশ॥

আছাড় খাইয়া প্রভু পড়য়ে ধরায়।

মুখে লালা ইতিউতি গড়াগড়ি যায়॥"

এই ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইল। ক্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেই তখন কীর্ত্তন থামিয়া গেল। কীর্ত্তন বন্ধ হইবার আরও এক কারণ হইতে পারে। হয়ত এতক্ষণ

নাচিয়া গাহিয়া ক্ষুধায় পেটের নাড়ী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহা না হইলে এত গভীর রাত্রে প্রভুকে পাকশালায় প্রবেশ করিতে হইবে কেন? কারণ অন্ন ত তাঁহাকেই পাকাইতে হইবে? করচা-লেখকও সেই কথাই বলিতেছেন। যথা—

"অর্দ্ধেক রজনী গেল এই মত করি।
তারপর ভিক্ষা অন্ন পাকাইলা হরি॥"

যাহাহৌক রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া প্রভু ভোগ লাগাইলেন, এবং

"মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলা গৌরহরি।"

তারপর গোবিন্দ বলিতেছেন—

"অনন্তর বসিলাম মুহি পত্র করি।
পত্র পুরি প্রসাদ দিলেন নরহরি॥"

দিনের বেলায় কাশীমিত্রের বাড়ীতে আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিলেও, সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নাচিয়া গাহিয়া গোবিন্দ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই গোগ্রাসে গিলিয়া তিনি হাস্‌ফাস্‌ করিতে লাগিলেন। শেষে গোবিন্দ বলিতেছেন—

"উদর ফুলিয়া মোর উঠিল যখন।

তখন অনন্যোপায় হইয়া—

প্রভুর চরণে গিয়া লইনু শরণ॥"

এখন প্রভুর অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে। অবশ অঙ্গ বিশ্রাম মাগিতেছে। কিন্তু এদিকে গোবিন্দের অবস্থা দেখিয়া প্রভুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি সাহায্যের আশায় হতাশ ভাবে ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন। মনের ভাব, যদি নিজজনের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পান। কিন্তু আশা পূরিল না। যে সকল ভক্ত

প্রভুর জন্ত শতবার প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যাঁহারা তাঁহার সামান্ত সেবা করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্ত মনে করেন, এবং সেই জন্তই যাঁহারা অশেষ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়?

এই যে চিত্রটি করচা-লেখক জীবন্ত ভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, ইহা দ্বারা প্রভু ও তাঁহার ভক্তদিগের সম্বন্ধে পাঠকের মনে কি ভাবের উদ্রেক হইল? ইহা পাঠ করিলে কি মনে হয় না যে, প্রভুর প্রতি ভক্তদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা একেবারে বাহ্যিক? আর, ভক্ত-দিগের উপর প্রভুর প্রভাব ততোধিক তরল ও মৌখিক? যাহাহোক করচার বর্ণনার বিষয় বলিতেছিলাম তাহাই বলিয়া যাই, পাঠক ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন।

প্রভু তখন অনন্যোপায় হইয়া, বিশ্রাম সুখ ভুলিয়া, গোবিন্দের পার্শ্বে বসিলেন, এবং তাহার স্ফীত উদরে ধীরে ধীরে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ তখন চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া হাঁস্‌ফাঁস্ করিতে-ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গোবিন্দের তখন এ কথা একবারও মনে হইল না যে, নিজের সামান্ত ক্লেশ দূর করিবার জন্ত তিনি প্রভুকে কত কষ্টভোগই না করাইতেছেন! তিনি প্রকৃতই তখন যদি "কায়া-ছাড়া-ছায়ার ন্তায়" প্রভুর অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি এরূপ স্বার্থপরের মত কার্য্য করিতে পারিতেন? কখনই নয়। করচা-লেখক যেরূপ ভাবে গোবিন্দের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় গোবিন্দ আপনার রসনার পরিতৃপ্তির জন্তই প্রভুর সঙ্গ লইয়াছিলেন এবং সেইজন্তই তাঁহার এত অনুগত হইয়াছিলেন।

যাহাহোক প্রভুর এইরূপ ভাবে হাত বুলাইবার ফলে, ক্রমে গোবিন্দের পেটের ফাঁপ কমিয়া আসিল। ইহাতে তিনি আরাম বোধ

করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রভুও তখন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সেই স্থানেই গা ঢালিয়া দিলেন।

প্রধান ঘটনাবলী যাহা করচায় নাই

করচা-লেখক কি ভাবে প্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত গোবিন্দের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দেখাইলাম। এখন কতকগুলি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব যাহা করচায় নাই, অথচ প্রভুর অন্যান্য লীলাগ্রন্থে আছে।

(ক) সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু শান্তিপুর হইতে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। এই ঘটনা মুরারি গুপ্তের করচা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, লোচনদাসের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে, নাই কেবল গোবিন্দদাসের করচায়। ইহা একটি প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ এই যাত্রায় প্রভুর সহিত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু করচা-লেখক এই যাত্রায় প্রভুর অনুসঙ্গী বলিয়া যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ ও জগদানন্দের নাম নাই।

(খ) "কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক দুইখানি অমূল্য ও অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের করচায় এই গ্রন্থ উদ্ধারের কোন উল্লেখ নাই। দীনেশবাবু বলিতেছেন,—কেবল করচায় কেন, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও এই গ্রন্থ সংগ্রহের কোন কথা নাই। দীনেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন। তবে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের গ্রন্থকারেরা ত প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে যান নাই, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে ইহার অনুল্লেখ আশ্চর্য্যের কথা নহে এবং মার্জ্জনীয়ও বটে। বিশেষতঃ বৃন্দাবন দাস তখন শিশু,

আর কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকখানি চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য উহার কোথায়ও অবান্তর কথা যোগ করিতে, আবার কোথায়ও বা ঐতিহাসিক ঘটনা বাদ দিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে এরূপ ভুল হওয়া কি সম্ভবপর হইতে পারে?

তবে এই গ্রন্থ সংগ্রহের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই দীনেশবাবুকে বলিতে হইয়াছে,—"এই গ্রন্থ মহাপ্রভু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র তত্ত্বটিও কি আমরা মূর্খ ভৃত্যের নিকট আশা করিতে পারি?" (৬৬)

আমরা বলিব নিশ্চয় পারি। কারণ গোবিন্দ যদি প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়া থাকেন, তবে তিনি গিয়াছিলেন মহাপ্রভুর বহির্ব্বাসাদি বহন করিবার জন্য। এই কথা যদি ঠিক হয়, তবে অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে এই গ্রন্থদ্বয়ও নিশ্চয় তিনি বহিয়া আনিয়া থাকিবেন। সুতরাং এই ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও, এই গ্রন্থ যখন প্রভুর ভৃত্যের সঙ্গে থাকিবার কথা, তখন করচায় ইহা লিপিবদ্ধ না করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

আরও একটি কারণে গোবিন্দের নিকট নিশ্চয় ইহা আশা করা যায়। দীনেশবাবু নিজেই লিখিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথে প্রচুর অবকাশ পাইয়া একান্তে গোবিন্দ নোট করার সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা অব্যবহিত পরেই পয়ার করিয়াছিলেন।" (৭৮) যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহের কথা করচায় না থাকিবার কোন সঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(গ) মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাইয়া বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে ছিলেন এবং সেখানে থাকিয়াই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অবলম্বন করেন। বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম। বালক গোপাল চারিমাস যাবৎ প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। এই চারিমাস সেখানে

অবস্থানকালে মহাপ্রভু তাঁহাদের তিনভ্রাতা ও বালক গোপালকে এরূপ কৃপা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা গোষ্ঠীসমেত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করেন। ভট্ট পরিবারের সঙ্গে সুদীর্ঘ চারিমাসকাল বাস করিয়াও তাঁহাদের কথা করচায় আদপে উল্লেখ না করা এতদূর অসম্ভব যে, কেবল এই একমাত্র কারণেই করচার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে।

(ঘ) তৎপরে কালাকৃষ্ণদাসের কথা। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন, তখন ভক্তেরা তাঁহার অনুমতি লইয়া কালাকৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচায়ও আছে যে, কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর যে দুইবৎসরকাল মহাপ্রভু দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলেন, তাহার মধ্যে এবং পুরীতে প্রত্যাগমনের পরেও আর একবারও কৃষ্ণদাসের কোন উল্লেখ করচায় নাই।

এইজন্য দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"যদিচ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, এই উভয়ই বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বজনাদৃত প্রামাণিক গ্রন্থ এবং উভয়ই চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাদের কোনটিতেই কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণের দক্ষিণগমনের উল্লেখ নাই।" (৫৫)

কিন্তু সেন মহাশয় পরক্ষণেই স্বীকার করিয়াছেন—"চৈতন্যভাগবতে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না।" কাজেই ইহাতে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তবে দীনেশবাবুর মতে,—"চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিত

আছে যে, কোন ব্রাহ্মণকেই চৈতন্যদেব তাঁহার সহিত দক্ষিণে যাওয়ার অনুমতি দেন নাই।" যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার বিনানুমতিতে কতিপয় ব্রাহ্মণ গোদাবরী পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন কি করিয়া? এই প্রশ্ন সকলের মনেই উঠিতে পারে, সেই জন্যই সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটকে সার্ব্বভৌমের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"গোদাবরীপর্য্যন্ত রামানন্দানুরোধাত্তেষাং সঙ্গোঽঙ্গীকৃতঃ।" অর্থাৎ রামানন্দের অনুরোধেই কেবল তাঁহাদিগকে প্রভু গোদাবরী পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়াছিলেন।

কিন্তু রামানন্দের সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও প্রভুর দেখা সাক্ষাৎ বা জানা শুনা ছিল না। সার্ব্বভৌমের নিকটই রামানন্দের কথা প্রভু সর্ব্বপ্রথম শুনিয়াছিলেন, এবং তাহাও প্রভুর দক্ষিণদেশে যাত্রা করিবার মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে। আর প্রভু যে কে, এবং তিনি যে দক্ষিণদেশে যাইতেছেন, ইহা রামানন্দ যে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, একথা কর্ণপুরের নাটকে কিম্বা অপর কোন গ্রন্থে নাই। কাজেই কবিকর্ণপুর ব্রাহ্মণদিগের গোদাবরী পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইবার যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সার্ব্বভৌমের মুখ দিয়া প্রকাশ করা কিছুতেই শোভনীয় হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও কবিকর্ণপুর কেন যে ঐ কথা লিখিলেন তাহার কারণ বলিতেছি।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় একখানি নাটক। সংস্কৃত নাটক রচনা করিবার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের গ্রন্থকার কবিকর্ণপুর তাঁহার বিরচিত "অলঙ্কার কৌস্তুভ" নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি যত বড় নাটককারই হউন না কেন, তাঁহাকে এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিতেই হইবে। আর কবি-কর্ণপুর স্বয়ং যে এই পথ-অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই কারণে তাহার নাটকে কতকগুলি কাল্পনিক বিষয় লিপিবদ্ধ করা এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই নাটকের সপ্তম অঙ্কে আছে যে, রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজসভায় সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর কথা শুনিতেছেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন,—সম্প্রতি প্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ লইতে সম্মত হন নাই। এইজন্য যে সকল ব্রাহ্মণ প্রভুর অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহারা গোদাবরী পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

সার্ব্বভৌমের এই কথা শেষ হইবার পরই, জনৈক প্রতিহারী আসিয়া জানাইল যে, গোদাবরী পর্য্যন্ত যে ব্রাহ্মণেরা গিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সভায় আনিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহারা সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ মত গোদাবরী পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী বলিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণদিগের কথা শেষ হইবার পরেই অপর একজন প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, কর্ণাটদেশের অধীশ্বর তাঁহার মন্ত্রী মল্লভট্টকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজার অনুমতি ক্রমে তখনই মল্লভট্টকে রাজসভায় লইয়া আসা হইল। তিনি উপবেশন করিয়া অন্যান্য কথার পর মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী বলিতে লাগিলেন।

এই ব্রাহ্মণদিগের ও কর্ণাটের রাজমন্ত্রীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এই ভাবে প্রভুর লীলাকাহিনী বর্ণনা করার কথা অপর কোন গ্রন্থে নাই। কিন্তু নাটকাকারে কোন বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে এই ভাবেই করিতে হয়। ইহার বর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশই সত্য হইলেও, আবশ্যক মত নাটকে কতকগুলি কাল্পনিক কথা আনিয়া ও সত্য কথা বাদ দিয়া উহা নাটকাকারে বর্ণিত হইয়া থাকে। কবিকর্ণপুরও তাহাই করিয়াছেন।

যাহাহৌক আমরা কালাকৃষ্ণদাসের কথা বলিতেছিলাম। কৃষ্ণদাস নামক একজন ব্রাহ্মণ যে মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, এ কথা দীনেশ বাবু অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে যাত্রা করিবার সময় ব্যতীত, পরবর্ত্তী দুই বৎসরকালের মধ্যে—অর্থাৎ যতদিন প্রভু দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার পরেও—কৃষ্ণদাসের কোন উল্লেখ করচায় নাই। তারপর, ব্রাহ্মণদিগের গোদাবরী হইতে ফিরিয়া আসিবার কথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে থাকিলেও উঁহাদের সহিত কৃষ্ণদাসের ফিরিবার কথা এই গ্রন্থে নাই।

তবুও দীনেশবাবু বলিতেছেন যে, অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত কৃষ্ণদাসও গোদাবরীর তীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দীনেশবাবুর এই উক্তির কোন প্রমাণ অবশ্য কোন গ্রন্থে নাই। তবুও তিনি এই সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা শুনুন।

দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার (চৈতন্যদেবের) সঙ্গে খানিকটা দূর গিয়াছিলেন, তাঁহারা গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার আদেশে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের জন্য কোন ব্রাহ্মণ সহচর নিযুক্ত না করাতে রাজা প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলে, পণ্ডিত-প্রবর রাজাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ লইতে স্বীকার করেন নাই। এইজন্য যাঁহারা গোদাবরী পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস যে শুধু গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের এই কথায় তাহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইতেছে।" (৫৫)

দীনেশবাবু উপরে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার

প্রথমাংশের উত্তর আমরা উপরে দিয়াছি। আর শেষাংশের উত্তরে বলিতে হইতেছে যে, কৃষ্ণদাস যে মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন তাহা গোবিন্দদাসের করচাতেও আছে। যথা—

"পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায়॥"

অর্থাৎ গোবিন্দ বলিতেছেন,—আমরা "তিনজনে" অর্থাৎ "প্রভু, কৃষ্ণদাস ও আমি" দক্ষিণ-যাত্রায় বাহির হইলাম। এবং ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে (যথা গোবিন্দের করচা)—

"অবধৌত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল করি অশ্রু বরিষণ॥
দক্ষিণ-যাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর।
সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণঠাকুর॥"

ইহাতে প্রভু অমত করিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন—

"যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।"

দীনেশবাবু শেষে বলিয়াছেন,—"আমরা করচার প্রমাণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, কৃষ্ণদাস খানিকটা দূর পর্য্যন্ত (গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত) দক্ষিণ-যাত্রায় অনুগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের এই খানিকটা যাওয়ার কথা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁহাকে দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।" (৫৫)

কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ভিন্ন কবিকর্ণপুর সংস্কৃত-ভাষায় "চৈতন্যচরিতামৃত" নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। নাটকে যেমন প্রয়োজন মত কাল্পনিক কথা বলিতে হয়, মহাকাব্যে সেরূপ হয় না। ইহাতে কেবল ঐতিহাসিক বিষয়ই থাকিবার কথা। সুতরাং মহাপ্রভুর

লীলাকাহিনী ইহাতে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কালা-কৃষ্ণদাসের কথাও এই গ্রন্থে আছে। তিনি কি প্রকারে মন্দবুদ্ধি পাষণ্ডদের কুহকে পতিত হন এবং মহাপ্রভু কি প্রকারে তাহাদের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন, তাহা এই মহাকাব্যের একাদশ সর্গের ২৩ হইতে ২৮ শ্লোকে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। অথচ মহাপ্রভুর দক্ষিণগমনের সময় কয়েকজন ব্রাহ্মণের গোদাবরী পর্য্যন্ত যাইয়া পুরীতে প্রত্যাগমনের কথা, যাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ এই গ্রন্থে নাই।

করচায় কতকগুলি বিষয় যে বাদ পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও দীনেশবাবু তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে মোটামুটি একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

(১) "সে সময়ে বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে মুসলমানদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার দরুণ পথ ঘাট নিরাপদ ছিল না। এইজন্য হয়ত সকল তীর্থেই ইহারা যাইতে পারেন নাই। তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, করচায় ভুল রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা অপ্রামাণ্য।" (৭৪)

(২) "গোবিন্দদাস যে সর্ব্বদাই নির্ভুল একথা বলা যায় না। তিনি হয়ত প্রত্যহই করচা লিখিতে সুবিধা পান নাই। পথে কোন কোন সময়ে বহুদিন জঙ্গলে কাটাইতে হইয়াছে। অনেক সময় নানা অসুবিধার মধ্যে চলিয়াছেন, এ অবস্থায় হয়ত ১০।১৫ দিন পরেও করচা লেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নহে। এই সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের স্মৃতি হয়ত মলিন হইয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে।" (৭৮)

দীনেশবাবু এখানে অনেকগুলি 'হয়ত' ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ

তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"অনুমান ও কল্পনা দ্বারা ইতিহাস লেখা যায় না।"

যাহাহৌক আমরা উপরে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনার কথা বলিলাম, সেগুলি যে প্রামাণ্য তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এইগুলির কোন উল্লেখ করচায় নাই। বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে মুসলমানদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইলেও, মহাপ্রভু যে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাইয়া বেঙ্কটভট্টের আলয়ে চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রকে কৃপা করিয়াছিলেন, কালাকৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন,—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর বিজয়নগরের রাজার ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সহিত নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গের কাহিনীর কোন সম্বন্ধই নাই।

দীনেশবাবুর দ্বিতীয় কৈফিয়ৎটি যে ভিত্তিহীন ও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-বিহীন, তাহা তাঁহার নিজের কথা দ্বারাই প্রামাণিত হইতেছে। কারণ তিনি বলিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথে প্রচুর অবকাশ পাইয়া একান্তে তিনি নোট করার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অব্যবহিত পরেই পয়ার করিয়াছিলেন।" (৭৮)

আন্দোলনের ইতিহাস

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"বিরোধীদলের আন্দোলন সুরু হইয়াছিল অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে।" (২১) একথা কতকটা ঠিক বটে। কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় মতিবাবু লিখিত গোবিন্দদাসের করচার সমালোচনা বাহির হইলে ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ এই করচার প্রাচীন পুথি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে

লেখেন। গোস্বামী মহাশয় তখন অবশ্য এই ধরাধামেই ছিলেন। পত্র-প্রেরকগণ আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তিনি এই সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক রহিলেন। কাজেই আন্দোলন চলিতে লাগিল।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সেই সময় গোস্বামী মহাশয় আমার শ্যামপুকুর লেনস্থিত ১২নং বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া করুণভাবে সমস্ত কথা জানাইয়াছিলেন।" (২১)

তাঁহাদের সেই গোপনমিলনের পর দীনেশবাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল উল্লিখিত আন্দোলন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। বন্ধুবরের করুণ ক্রন্দনে তাঁহার কোমল হৃদয় কেন যে তখন বিগলিত হয় নাই, কিংবা বিগলিত হইলেও কেন যে তখন তাঁহার কোন অভিব্যক্তি হয় নাই এবং তিনি কেন যে এই দীর্ঘকাল কোন কথা না বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি অবশ্য একটা কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—"ইহার মধ্যে সাহিত্য পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের বৈরাগ্য খণ্ডে স্পষ্টই লিখিত আছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সহচর ছিলেন 'গোবিন্দ কর্ম্মকার'। এই আবিষ্কারের ফলে প্রতিবাদীর দল নিরস্ত হইয়া গেলেন। ইহার পর প্রায় ২৭।২৮ বৎসরকাল প্রতিবাদিগণ একেবারে নীরব হইয়াছিলেন।" (২২) অর্থাৎ দীনেশবাবু বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, সেইজন্য এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

কিন্তু তাঁহার এই উক্তি ঠিক নহে। কারণ ইং ১৮৯৫ সালে গোবিন্দদাসের করচা মুদ্রিত হয় এবং তারপর সেই বৎসরই কার্ত্তিক মাসের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় মতিবাবুর লিখিত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

ইহার দশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ইং ১৯০৫ সালে) সাহিত্য পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই দশ বৎসর করচা সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ থাকিবার এবং এই সম্বন্ধে তাঁহারে উচ্চবাচ্য না করিবার কোন হেতু দীনেশবাবু দেখান নাই। তারপর তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"এদেশে একটা কিছু আরম্ভ হইলে তাহার ঢেউ অনেক দিন চলিতে থাকে। সুতরাং সেই যে আন্দোলন সুরু হইল, এখনও তাহা চলিতেছে।" (২২)

ফলকথা, করচার প্রাচীন পুথি দেখাইবার কোন সুবিধা করিতে না পারায়, আন্দোলন সমভাবে চলিতেছিল—আদপে বন্ধ হয় নাই। যদি বন্ধ হইত, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দীনেশবাবুর গোপনমিলনের পর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল একেবারে নিস্তব্ধ থাকিয়া, হঠাৎ এমন কি কারণ উপস্থিত হইল, যাহার জন্য—করচার প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলির অধিকাংশ গুদমজাত থাকা সত্ত্বেও—সেন মহাশয় প্রকাণ্ড ভূমিকা সহ ইহার এক অভিনব সংস্করণ বাহির করিতে বাধ্য হইলেন?

সেন মহাশয় ইহার কৈফিয়ৎ যাহাই দিউন না কেন, আমাদের কিন্তু মনে হয়, সেই গোপনমিলনের সময় তাঁহাদিগের মধ্যে যে জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল, তাহার পরিপোষক কোন সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায়, এই সুদীর্ঘকাল তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। শেষে যখন 'একে একে নিভিল দেউটি'—অর্থাৎ যাঁহারা এই করচা-রহস্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা একে একে যখন পরলোকবাসী হইলেন, এমন কি গোস্বামী মহাশয় পর্য্যন্তও তাঁহাদের অনুসঙ্গী হইলেন—তখনই শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল। সেন মহাশয়ও তখন 'শুভস্য শীঘ্রং' এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার ত্রিশ বৎসরের বিজ্ঞানসম্মত গভীর গবেষণার ফল লোকচক্ষুর গোচরে আনয়ন করিলেন।

প্রাচীন পুথির কি হইল ?

দীনেশবাবু বলিয়াছেন,—"যাঁহারা এই করচার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, "করচার প্রাচীন পুথি বাহির কর তবে বিশ্বাস করিব।" ইহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন,—"দুইখানি পুথি দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় করচা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উভয়খানিই মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব।" (১৬)

উভয়খানি প্রাচীন পুথিই যে মালেকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা সেন মহাশয় জানিলেন কি করিয়া ? তাঁহার সংবাদদাতা বনোয়ারীলাল কেবল একখানি—অর্থাৎ কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুথিখানি—ফিরাইয়া দিবার কথা বলিয়াছেন। আর, পাগলা গোঁসাইদের বাড়ীর পুথিখানির প্রাপ্তিসংবাদ তিনি দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার পরিণাম যে কি হইল, সে সম্বন্ধে কোন কথা তিনি বলেন নাই। জয়গোপাল গোস্বামী কিংবা অপর কেহ যদি এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন, তবে সেন মহাশয় তাহা নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন।

"পুথি মালেককে ফেরত দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব"—একথা কালিদাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুথিখানি সম্বন্ধে বরং প্রযোজ্য হইতে পারে, কারণ উহার মালিকের নামধাম জানা যায় নাই। কিন্তু অপর পুথিখানির মালিক যখন শান্তিপুরনিবাসী, বিশেষতঃ গোস্বামী-সন্তান এবং জয়গোপালের নিকট-আত্মীয়, তখন ঐকথা আদৌ বলা চলে না। কারণ এই পুথিখানি যদি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও ইহার অনুসন্ধান না করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া

যায় না। বিশেষতঃ করচা মুদ্রিত হইবার অল্পকাল পরেই প্রাচীন পুথিখানি কেহ কেহ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তখন যদি পাগলা গোঁসাইদের বাড়ীতে অনুসন্ধান করা হইত, এবং প্রকৃতই যদি উহার কোন অস্তিত্ব থাকিত, তবে উহার সন্ধান না পাইবার কোন কারণই দেখা যায় না। আর যদি সে সময় উহার অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, তবে সে কথা সেন মহাশয় নিশ্চয় ভূমিকায় উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় "উভয় পুথি মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব"—ইহাই বলিয়া সেন মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন, অর্থাৎ ইহাতেই যেন তাঁহার সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া গেল।

তিনি কথায় কথায় "বিজ্ঞানসম্মত" অনুসন্ধানের কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিত *হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ইতিহাসের ধার ধারেন না।"* কিন্তু সেন মহাশয়ের মত ইতিহাসের ধার ধারা যাঁহাদের একচেটিয়া, তাঁহাদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা যে কিরূপ তাহা বুঝিয়া উঠা অপরের পক্ষে একেবারে অসাধ্য।

সেন মহাশয় বলিতেছেন,—বহুকাল (প্রায় ৩০ বৎসর) পূর্ব্বে পুথি ফেরত দেওয়া হয়, 'এখন' তাহা পাওয়া অসম্ভব। 'এখন' পাওয়া অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যে সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল কথা জানাইয়াছিলেন, তখন অনুসন্ধান করা ত সহজসাধ্য ছিল, তবে সে সময় তিনি নির্ব্বাক ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন কেন? ইহা দ্বারা কি বোঝা যায়?

অপর, এই দুইখানি পুথির অস্তিত্ব যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে ইহা ভিন্ন আরও পুথি যে পাওয়া যায় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি?—এই কথা পাছে কেহ বলেন, ইহাই ভাবিয়া সেন মহাশয় সম্ভবতঃ পুথি দুষ্প্রাপ্য

হইবার আরও কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"খড়ো ঘরের চালের ফুটা দিয়া বর্ষার দিনে অজস্র জলধারা বর্ষিত হইয়া প্রতি বৎসর কত শত পুথি যে নষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া অগ্নিদাহ, বন্যা ও শিশুদিগের দৌরাত্ম্য তো আছেই। অনেকে আবার গঙ্গাগর্ভেও প্রাচীন পুথি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।" (১৬)

"সকল পুথি সম্বন্ধেই তো এই কথা বলা যাইতে পারে? কিন্তু এরূপ একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইবার কথা তো অপর কোন পুথি সম্বন্ধে শোনা যায় না?"—এ কথাও তো লোকের মনে উঠিতে পারে, ইহাই মনে হওয়ায়, সেন মহাশয় তাহারও উত্তর স্থির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই করচাতে এরূপ একটা আভাস আছে যে, করচাখানি বিশেষ কারণে গোবিন্দদাস গোপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার প্রাচীন পুথি খুব সুলভ হইবে না, একথা নিশ্চয়।" (১৬)

এতদ্ভিন্ন সেন মহাশয়ের মনে আরও একটি কথার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, হয়ত কোন কারণে গোবিন্দদাস পুথিখানি গোপনে রাখিতে পারেন; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর, দুইখানি পুথি প্রাপ্ত হওয়া যদি সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, তখন পুথিখানি আর গোপনে ছিল না। কাজেই তখন ইহার দুইখানির অধিক সংখ্যক পুথি না পাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই কথা মনে হওয়ায়, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক অভিনব কথার উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বলিলেন,—"প্রাচীন পুথি দুষ্প্রাপ্য হইবার এই সকল কারণ ত আছেই, তাহার উপর আবার এই করচার পুথির বিরুদ্ধে এক বিষম ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" (১৬)

কিন্তু এই "বিষম ষড়যন্ত্র" কবে সুরু হইয়াছিল তাহা সেন মহাশয় বলেন নাই। যদি অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে এই পুথির সম্বন্ধে

আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময় হইতে ইহা সুরু হইয়া থাকে, তবে সে আর কতদিনের কথা? কিন্তু গোবিন্দদাস ছিলেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সহচর। সে ত প্রায় পাঁচশত বৎসরের কথা। আর সেন মহাশয় ত বলিয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত জিনিষপত্র খোঁজ করিবার সময় করচা ধরা পড়িবে, এবং এরূপ মূল্যবান্ ইতিহাসের প্রচার তখনই আরম্ভ হইবে।" (৮০)

সুতরাং এই আধুনিক ষড়যন্ত্র "বিষম" হইলেও, সেই পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন পুথির প্রচার যে ইহা দ্বারা বন্ধ হইতে পারে না, এই সহজ কথাটি সেন মহাশয় যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি ধ্যানস্তিমিত মুনির ন্যায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং ইহার ফলে এক অভিনব পন্থা তাহার মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল। সেই বিচিত্র পন্থার কথা নিম্নে বলিতেছি।

অভিনব পন্থা

সেন মহাশয় তখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যতই যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করুন না কেন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার যো নাই যে, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা গোবিন্দদাসের করচার মৌলিকতা প্রমাণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রাচীন পুথির প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে উহার প্রাপ্তির আশা আদপে না থাকে, সেখানে এরূপ এক ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে, যাঁহার পক্ষে এই পুথি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত থাকা সম্ভবপর, এবং যিনি প্রয়োজনানুসারে এই সম্বন্ধে যে কোন কথা বলিতে সক্ষম হইবেন, এবং যাঁহার কথা সহসা কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

কথায় বলে সাধিলেই সিদ্ধি। এখানে দীর্ঘকাল সাধনার ফলে বিধাতা সেন মহাশয়কে ঠিক সেইরূপ এক ব্যক্তিকে যোটাইয়া দিলেন। ইহার নাম শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী। যিনি গোবিন্দদাসের করচাখানি লোকচক্ষুর গোচরে আনয়ন করেন, ইনি সেই ৺জয়গোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র। বনোয়ারীলালকে সাক্ষিরূপে লাভ করা গেলেও তাঁহার পদগৌরব সাধারণের চক্ষে বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক। সেইজন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বনোয়ারীলালকে করচার নব সংস্করণের সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহযোগিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সেন মহাশয়ের সম্পাদিত করচাখানিকে নব সংস্করণ বলা হইয়াছে। আমাদের কিন্তু মনে হয় উহাকে "নব সংস্করণ" না বলিয়া "অভিনব সংস্করণ" বলা কর্ত্তব্য ছিল। কারণ এই সংস্করণে চিরন্তন প্রথার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয় এখানে দেখাইতেছি।

(ক) 'অশেষ নিগ্রহ,' 'অকৃতজ্ঞতা-লাঞ্ছিত' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া 'প্রভুপাদ স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাভাগ'কে এই সংস্করণ উৎসর্গ করা হইয়াছে। কিন্তু উৎসর্গ করিয়াছেন যুগ্ম সম্পাদকের মধ্যে সবে একজন—অর্থাৎ 'শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন'।

(খ) শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামীকে সম্পাদকীয় আসনে বসাইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি হইতেছেন এই মামলার প্রধান সাক্ষী, এবং এই ভাবেই তাঁহাকে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার জবানবন্দীটি "গোবিন্দদাসের করচা উদ্ধারের ইতিহাস" বলিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(গ) এই "জবানবন্দী" বা "করচা উদ্ধারের ইতিহাস"এর উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া মূল-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভূমিকাটি মৌলিক

গবেষণার ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন ; এবং ইহাই সূত্ররূপে ধরিয়া লইয়া, যুক্তিতর্ক, জল্পনা-কল্পনা, অবান্তর প্রসঙ্গ, প্রভৃতির সাহায্যে শাখাপ্রশাখা পল্লবাদি বিস্তার করিয়া, সেন মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা তাঁহার ৭০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(ঘ) এই ভূমিকার প্রারম্ভেই মূল-সম্পাদক মহাশয় তাহার সহযোগী শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামীর পরিচয় ও গুণগরিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় করচা সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত 'খিচুড়ি' 'পোলাও' প্রভৃতি বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। * * কঠোর সত্য কথা বলিতে যাইয়া তিনি সময় সময় মনুক্ত সাবধানতাও রক্ষা করিতে পারেন না। ইঁহার পিতা শান্তিপুরনিবাসী ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দদাসের করচা প্রকাশিত করেন। তখন বনোয়ারীলালের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর ছিল, এবং তিনি সর্ব্বকার্য্যে পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন ; সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই চাক্ষুষ ঘটনা।"

ভূমিকাটি লিপিবদ্ধ করিবার সময় সেন মহাশয় আপনার তর্কযুক্তির মূলবিষয় বনোয়ারীলালের জবানবন্দীর গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে তাঁহাকে ঐ গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া পড়িতে হইয়াছে। তখন অনন্যোপায় হইয়া, বনোয়ারী লালের "চিঠির" দোহাই দিয়া, সেই প্রসঙ্গ সুকৌশলে মৌলিক গবেষণার মধ্যে আনিতে হইয়াছে।

এই বিস্তৃত ভূমিকার মালমশলাদি সংগ্রহ করিবার এবং সুবিধা সুযোগাদি পাইবার জন্য, সেন মহাশয়কে সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও মস্তিষ্কের পরিচালন, এবং অসাধ্য সাধনের জন্য

কিরূপে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইয়াছে, তাহা এই "গোবিন্দদাসের করচা-রহস্য" পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে।

বনোয়ারীলাল কর্ত্তৃক এই "ইতিহাস" সম্বন্ধে মালমশলাদি কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই পাঠকবর্গকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য, উহা হইতে স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্যসহ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

করচা উদ্ধারের ইতিহাস সম্বন্ধে মন্তব্য।

বনোয়ারীলালের এই 'ইতিহাস' এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহা পাঠ করিবার সময় মনে হয় তিনি যেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জবানবন্দী দিতেছেন। আদালতের সাক্ষীরা হলফ্ করিয়া উকিল কৌন্সিলের প্রশ্নের জবাব দিয়া থাকে। তিনিও যেন সেইভাবে হলফ্ করিয়া জবানবন্দী দিয়াছেন। সেই জন্যই বোধহয় তাঁহার কথাগুলির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। আদলতের সাক্ষীর ন্যায় তিনিও বলিয়াছেন,—

"আমার নাম বনোয়ারীলাল গোস্বামী। আমি স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার বয়স ৭০ বৎসর। বাড়ী শান্তিপুর। কিছুকালের জন্য প্রাচীন পুথিখানি আমাদের বাড়ীতে ছিল। আমিও তাহা দেখিয়াছিলাম। * * আমি যাহা লিখিলাম তাহা সরল সত্য।"

বনোয়ারীলাল তাঁহার 'ইতিহাস' বা জবানবন্দী এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,—"প্রায় ৪৫ বৎসর গত হইল একদিন শান্তিপুরনিবাসী কালিদাস নাথ কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ (পুথি) আমার পিতৃদেব

৺জয়গোপাল গোস্বামীর নিকট লইয়া আসেন। এই পুস্তকগুলির মধ্যে একখানি 'গোবিন্দদাসের করচা' ও একখানি 'অদ্বৈতবিকাশ' গ্রন্থ ছিল। বাবা এই দুইখানি পুস্তক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুস্তক মনে করিয়া পড়িবার নিমিত্ত গ্রহণ করেন। কালিদাস প্রথমতঃ পুস্তক দুইখানি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন, পরে বাবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য প্রাচীন পুথি দুইখানি তাঁহার নিকট রাখিয়া যান। পিতৃদেব অতি সত্বর লিখিতে পারিতেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যে এই পুথি দুইখানি নকল করিয়া ফেলেন।"

বনোয়ারীলাল যদিও এখানে পুথি দুইখানি ফিরাইয়া দিবার কথা বলেন নাই, 'হয়ত' বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তথাপি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নকল করা হইলেই প্রতিশ্রুতি মত উহা কালিদাস নাথকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই ইতিহাসের অন্যত্র লিখিত আছে,—"করচাখানি প্রকাশকল্পে পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য শান্তিপুরনিবাসী পরমভাগবত ৺মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন অনেকেই প্রাচীন পুথিখানি দেখিয়াছিলেন।" (১১)

এখানে "প্রাচীন পুথিখানি" যদি কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত করচার পুথি হয়, তাহা হইলে "অনেকেই" ইহা দেখিতে পারেন না। কারণ বনোয়ারীলালের ইতিহাস অনুসারে, গোস্বামী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধক্রমে কালিদাস নাথ সবে মাত্র "কয়েকদিনের জন্য" প্রাচীন পুথি তাঁহার নিকট রাখিয়া যান, এবং গোস্বামী মহাশয়ও তাড়াতাড়ি নকল করিয়া যথাসময়ে উহা কালিদাস নাথকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে "অনেকেই" তখন ইহা দেখিতে পারেন না। ইহার কারণ বলিতেছি।

(১) যখন এই পুথির কথা পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না তখন,—এবং এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কোন আন্দোলন উপস্থিত হইবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই যাহাতে,—লোকের মনে এই পুথি দেখিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে।

(২) গোস্বামী মহাশয় সে সময় এই পুথি নকল করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষেও তখন বাহিরের লোক ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে এই পুথি দেখাইবার বা পড়িয়া শুনাইবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না।

বনোয়ারীলালের ইতিহাসে গোবিন্দদাসের করচার দুইখানি প্রাচীন পুথির প্রাপ্তিসংবাদ পাওয়া যায়। ইহার একখানি কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, এবং অপরখানি পাগলা গোঁসাঞীদের বাড়ীর হরিনাথ গোস্বামী প্রদত্ত। প্রথমখানির গোড়ার ২।৩ ফর্ম্মার পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাইবার পর, যখন উহা পুনরায় পাইবার আশা আদপে ছিল না, ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় পুথিখানি জুটিয়া যায়। বনোয়ারীলাল বলিয়াছেন,—"পাগলা গোস্বামীর বাড়ীর পুথিখানি অত্যন্ত পাঠবিকৃতি দোষে দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট যে 'কিছু কিছু নোট' ছিল, তাহার সহিত ঐ পুথির লেখা মিলাইয়া কষ্টে সৃষ্টে নষ্টপত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়।" (১০)

এই "কিছু কিছু নোট" কোন সময় এবং কি জন্য করা হইয়াছিল, বনোয়ারীলাল তাঁহার ইতিহাসে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অবশ্য এই ইতিহাসে আছে যে, কালিদাস নাথের সংগৃহীত পুথিখানির কোন কোন স্থান প্রাচীন জটিল শব্দের পরিবর্ত্তন এবং কখনও কোন কীটদষ্ট ছন্নাংশ লুপ্ত হওয়ায় পূরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এই পুথি সময় মত ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া উহা সত্বর নকল করিবার প্রয়োজন হয়।

কাজেই সে সময় উহা পরিবর্ত্তন বা পূরণ করিবার জন্য অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়া নকল করাই গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয়, সময় মত কালিদাসকে পুথি ফিরাইয়া দিয়া, তারপর গোস্বামী মহাশয় এই নকল-পুথি ধীরে সুস্থে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিবর্ত্তন ও পূরণাদি করিয়া থাকিবেন।

এরূপ স্থলে "নোট" করিবার কোন আবশ্যকতা দে·া যায় না। বরং শেষে সময় মত যদি পরিবর্ত্তনাদি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালিদাস নাথের প্রাচীন পুথি হইতে প্রথমে যাহা নকল করা হইয়াছিল, সেই নকল পুথি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট থাকিবার কথা; এবং তাহা হইতেই ছাপিবার জন্য কাপি প্রস্তুত করাই সম্ভব। তজ্জন্য অন্য পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এরূপ স্থলে কালিদাসের পুথি নকল করিবায় সময় "কিছু কিছু নোট" করিবার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের মনে হয়, এই নোট রাখিবার কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

বনোয়ারীলালের ইতিহাসে আছে,—"এই পুস্তকে দাক্ষণাপথের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, তাহা আজীবন কেহ দাক্ষিণাত্য ঘুরিয়া না আসিলে কল্পনা করিতে পারে না।" (১১) যদি তাহাই হয় তবে গোবিন্দ কর্ম্মকারই বা দক্ষিণাপথের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁহার করচায় লিপিবদ্ধ করিলেন কি করিয়া? তিনি ত আর আজীবন দক্ষিণদেশে ঘুরিয়া বেড়ান নাই?

কিন্তু এই সকল বিষয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সারাজীবন ঘুরিয়া বেড়াইবার কোন প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছা থাকিলে এবং চেষ্টা করিলে ঘরে বসিয়াই ইহা রচনা করা যাইতে পারে। কারণ আমাদের পুরাণাদিতে এবং সরকারী ও বে-সরকারী রিপোর্ট ও গ্রন্থাদিতে ভারতবর্ষের

সমগ্র তীর্থস্থান, দেবমন্দির ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা আছে। কেবল ভারতবর্ষের নহে, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ স্থানাদির বিবরণও গ্রন্থসমূহে বিশদভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে ও চেষ্টা করিলে, ঘরে বসিয়াই ইহা রচনা করা যাইতে পারে। তবে অবশ্য কল্পনাদেবীর কৃপা, কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তি থাকা এবং অনুসন্ধিৎসু হওয়া আবশ্যক।

বনোয়ারীলাল গভীর দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন,—"যাঁহারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে নিতান্ত অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিতেছেন, এবং প্রতারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের এই ঘোর বৈষ্ণব-নিন্দাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপ অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগে যে আমাদের অন্তঃকরণে কি কষ্ট হইতেছে তাহা আর কি লিখিব?"

বনোয়ারীলালের ন্যায় পিতৃভক্ত পুত্র অতি বিরল। দীনেশ বাবুও বলিয়াছেন—"বনোয়ারীলাল সর্ব্বকার্য্যে পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।" তাহা না হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে এরূপ কষ্ট হইবে কেন? তাঁহার এই কষ্টের জন্য আমরাও বিশেষ সহানুভূতি জানাইতেছি। তবে একটি কথা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের মনের এই ধাঁধাঁ ঘুচাইবার জন্য তাঁহার নিকট আমাদের একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে।

এই পিতৃভক্তি কোন্ সময় হইতে তাঁহার অন্তঃকরণে প্রকাশ পাইয়াছিল? তাঁহার পাঠ্যাবস্থার কথা আমরা বলিতেছি না। কারণ তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, আর তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়। তখন পড়াশুনার জন্য হয়ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে তাড়না করিতেন, এবং হয়ত তখন তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় ক্লাস হইতে সরিয়া পড়িয়া সহপাঠীদের নিকট তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবও প্রকাশ করিতেন। সুতরাং সে সময় তাঁহার অন্তঃকরণে পিতৃভক্তি প্রকাশ না পাইতেও পারে।

কিন্তু দীনেশবাবু যে সময়ের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ যে সময় মতিবাবু করচার সমালোচনা বাহির করেন এবং তাহাই লইয়া আলোচনা চলিতে থাকে, তখন বনোয়ারীলাল ছিলেন কোথায়? তখন কি তিনি প্রকৃতই "সর্ব্বকার্য্যে পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন," না সুদূর রংপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধা নামক স্থানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লইয়া এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার মনঃসংযোগ করিবার অবসর আদপে ছিল না? এইরূপ একটা কিছু না হইলে, সে সময় করচা লইয়া এত আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল, অথচ তিনি একেবারে নির্ব্বাক হইয়াছিলেন কেন? তবে কি তিনি উহা তখন আদপে জানিতে পারেন নাই? কারণ, জানিতে পারিলে নিশ্চয় তাঁহার অন্তঃকরণ কষ্টে ভরিয়া যাইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহার পরেও প্রায় ত্রিশ বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল; ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন; কিন্তু তখনও কি তিনি মোহে এরূপ আচ্ছন্ন ছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণে পিতৃভক্তি একেবারেই উদ্দীপ্ত হইতে পারে নাই? শেষে বহুকালের বাপ্য সেই পিতৃভক্তি একেবারে এরূপ উথলিয়া উঠিল যে তিনি আর স্ববশে থাকিতে পারিলেন না, এবং প্রায় বাহাত্তর বৎসর বয়সে করচা উদ্ধারের এক অভিনব ইতিহাস রচনা করিয়া, তাঁহার পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা জগতে প্রচার করিলেন!

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল গোস্বামী লিখিত ইতিহাসের পাদটীকায় মূল-সম্পাদক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"একখানি চিঠিতে বনোয়ারীলাল আমাকে আরও কয়েকটি কথা বেশী লিখিয়াছেন। তাহা এই—'আমার মনে আছে কালিদাস বলিয়াছিলেন, করচার ভাষা অতি নির্ম্মল, কোথায়ও অতিরঞ্জিত নাই। প্রসাদ গুণে পুস্তকখানি পূর্ণ।' একে

প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থ, তাহার উপর ভাষার সারল্য তারল্য, ইহা পিতৃদেবকে একান্ত আকৃষ্ট করিল। তখনই গোবিন্দদাসের করচার অধ্যয়ন আরম্ভ হইল। কয়েক পৃষ্ঠা অধ্যয়নের পরই স্বর্গীয় মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। বাবা আগ্রহের সহিত বলিলেন,—মদন, এক অপূর্ব্ব পুস্তক, আবার গোড়া হইতে পড়ি, শুনিয়া যাও।"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বনোয়ারীলাল করচা উদ্ধারের ইতিহাস লিখিলেন, অথচ তাহাতে ৺মদনগোপাল গোস্বামী ও ৺কালিদাস নাথ সম্পর্কীয় এরূপ অত্যাবশ্যকীয় কথার কোন উল্লেখ করিলেন না! অথচ এই কথাগুলি বলিবার জন্যই তাঁহাকে একখানি স্বতন্ত্র চিঠি লিখিতে হইল! কিন্তু এই চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন কবে? ইতিহাস লিখিবার পরে নিশ্চয় নহে, কারণ তাহা হইলে ইতিহাসের পাদটীকায় উহা বাহির হইত না। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাটি যদি প্রকৃত হয়, তবে এরূপ একটি আবশ্যকীয় ঘটনা বনোয়ারীলাল তাঁহার ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিলেন না কেন? ইতিহাস লিখিবার সময় এই ঘটনাটি কি তাঁহার স্মরণপথে পতিত হয় নাই? কিন্তু সেন মহাশয় তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এরূপ ভুল হওয়া যে অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন, গোবিন্দদাসের করচার প্রাচীন পুথি সম্পাদনের সময় ৺জয়গোপাল গোস্বামী উহার কোন কোন স্থানের পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে নূতন শব্দ যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্রগুলি নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আর, ত্রিশ বৎসর পরে, প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে, বনোয়ারীলাল করচার নব সংস্করণে সেই সকল

পরিবর্ত্তিত শব্দের স্থলে পূর্ব্বের শব্দগুলি সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা কম স্মরণশক্তির পরিচায়ক নহে। কিন্তু ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তিনি করচা উদ্ধারের ইতিহাস লিখিলেন, অথচ এরূপ একটি আবশ্যকীয় বিষয় বাদ পড়িয়া গেল! যাঁহার এরূপ অদ্ভুত স্মরণশক্তি তিনি যে এই আবশ্যকীয় বিষয়টি তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইবেন ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে কি সেন মহাশয়ের স্মৃতিভ্রমের জন্য এইরূপ ঘটিয়াছে? অর্থাৎ সেন মহাশয় যাহা বনোয়ারীলালের চিঠি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা বনোয়ারীলালের লেখা নহে,—সেন মহাশয় উহা কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, এবং শেষে ভ্রমবশতঃ বনোয়ারীলালের চিঠি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন?

কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া হইতে পারে? কারণ কেবল যে একস্থানে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে,—সেন মহাশয় তাঁহার লিখিত ভূমিকার কয়েক স্থানে বনোয়ারীলালের চিঠির দোহাই দিয়া অনেক কিছু বলিয়াছেন। অথচ তাহার কোনটিরই উল্লেখ বনোয়ারীলাল তাঁহার করচা উদ্ধারের ইতিহাসে করেন নাই। এরূপ হইবার কারণ কি?

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"গোস্বামী মহাশয় যখন গোবিন্দদাসের করচা প্রকাশিত করেন, তখন বনোয়ারীলালের বয়স প্রায় ৪০ ছিল এবং তিনি সর্ব্বকার্য্যে পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই চাক্ষুষ ঘটনা।" (১৫)

কিন্তু বনোয়ারীলাল তাঁহার করচা উদ্ধারের ইতিহাসে এই কথার কোন উল্লেখ করেন নাই; আর তাঁহার পিতৃদেব যখন ছাপিবার জন্য উহা সম্পাদন করিতেছিলেন, তখন তিনি যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন,

এ কথাও বনোয়ারীলাল পরিষ্কার ভাবে কোথায়ও বলেন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, কিছুকালের জন্য (৺কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত) প্রাচীন পুথিখানি তাঁহাদের ঘরে ছিল, এবং তিনিও তাহা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দীনেশবাবুর হিসাব অনুসারে, কালিদাস নাথ যখন করচার প্রাচীন পুথি জয়গোপালকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ১৪।১৫ বৎসর পরে, গোস্বামী মহাশয় প্রেসে দিবার জন্য উহা সম্পাদন করেন। সুতরাং ১৪।১৫ বৎসর ব্যবধানের দুইটী ঘটনা এক সময়ে সংঘটিত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ বনোয়ারীলাল কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন যে, পুস্তকের কোন কোন স্থানে প্রাচীন জটীল শব্দ তাঁহার পিতৃদেব সম্পাদনকালে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ইহা দ্বারা চাক্ষুষ দর্শন প্রমাণিত হয় না। এই ধরণের কথা অন্যের নিকট শুনিয়া কিংবা অনুমান করিয়াও লেখা যাইতে পারে। আবার ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন,—"হয়ত কখন কোন কীটদষ্ট ছত্রাংশ লুপ্ত হওয়াতে তাহা তিনি (জয়গোপাল) পূরণ করিয়াছেন।" একথা স্বচক্ষে না দেখিয়াও বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ "হয়ত" কথা দ্বারা মনে হয়, ইহা তাঁহার চাক্ষুষ দেখা নহে।

আর এক কথা। করচার প্রথম সংস্করণ ছাপিবার জন্য জয়গোপাল যখন ইহা সম্পাদন করেন, তখন বনোয়ারীলাল যে শান্তিপুরে ছিলেন এবং তাঁহার পিতাকে উহা সম্পাদন করিতে দেখিয়াছিলেন, একথাও তিনি কোন স্থানে বলেন নাই। অথচ আমরা শান্তিপুরনিবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি যে, উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বনোয়ারীলাল গাইবান্ধা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সে সময় গ্রীষ্মের ছুটীতে মাঝে মাঝে তিনি শান্তিপুরে আসিতেন; কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে আর আসেন না।

বনোয়ারীলাল লিখিয়াছেন,—"কালিদাস নাথকে প্রাচীন পুঁথি ফিরাইয়া দিবার কয়েক বৎসর পরে পিতৃদেব ঐ পুঁথির দুই তিনটী ফরমা (তাঁহার স্বহস্ত লিখিত) শিশিরবাবুর নিকট লইয়া আসেন।" কিন্তু মতিবাবু তাঁহার সমালোচনায় লিখিয়াছেন যে,—"করচার প্রথম হইতে রায় রামানন্দের সহিত মিলন পর্য্যন্ত অংশ রাণাঘাটের বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমার অগ্রজ শিশিরবাবুকে অর্পণ করেন।"

এই সমালোচনা যখন বাহির হয় তখন জয়গোপাল জীবিত ছিলেন। মতিবাবুর লেখায় যদি ভুল থাকিত তাহা হইলে তিনি উহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ত তাহা করেনই নাই, বরং মতিবাবুর কথার পোষকতাই করিয়াছিলেন। কারণ তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, রাণাঘাটের যজ্ঞেশ্বরবাবু করচার পুঁথির গোড়ার কয়েক ফর্ম্মার পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া শিশিরবাবুকে দিয়াছিলেন। আর বনোয়ারীলাল যে মতিবাবুর সমালোচনার কথা জানিতেন, তাহা তাঁহার ইতিহাস পাঠ করিয়াই জানা যায়। সুতরাং মতিবাবুর সমালোচনায় ভুল থাকিলে, বনোয়ারীলাল সে সময় ইহার প্রতিবাদ করেন নাই কেন?

বনোয়ারীলাল আরও বলিয়াছেন,—"শিশিরবাবু করচার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই মুগ্ধ হন এবং পিতৃদেবকে সমস্ত পুঁথিখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পিতৃদেব বলেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই পুস্তকখানি নিজেই প্রকাশ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি।' শিশির-বাবু তদুত্তরে বলেন, 'তবে ইহা আপনিই প্রকাশ করুন। যে কয়েক পৃষ্ঠা আপনি আনিয়াছেন, তাহা রাখিয়া যান। আমি পড়িয়া সাত দিনের মধ্যে ইহা আপনাকে রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইয়া দিব। (৯)

বনোয়ারীলালের উক্ত কথাও ভিত্তিশূন্য। কারণ মতিবাবুর সমালোচনায় আছে যে, শম্ভু মুখার্জির নিকট হইতে করচার পুথির প্রথম দুই তিন ফর্ম্মার পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাইবার পর, জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় শিশিরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, এবং সেই সময় করচার অবশিষ্ট অংশ শিশিরবাবুকে প্রদান করেন। তিনি ইহা খাতায় নকল করাইয়া লয়েন।* সেই নকল খাতা অদ্যাপিও আমাদের ঘরে আছে। এইবারই গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শিশিরবাবুর প্রথম আলাপ পরিচয় হয়; ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

এই সম্পর্কে বনোয়ারীলাল আরও যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নহে। আমাদের মনে হয়, এই সকল অলীক কথা প্রকাশ করিয়া মহাত্মা শিশিরকুমারকে সাধারণের চক্ষে হীনপ্রভ করিবার চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সেইজন্যই ভূমিকায় লেখা হইয়াছে যে, করচার বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে; অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার মালেকেরা করচার বিরুদ্ধে সমালোচনা বাহির করিয়া এই আন্দোলন সুরু করেন।

বনোয়ারীলাল তাঁহার ইতিহাসে এই আন্দোলন উপস্থিত করা সম্বন্ধে দুইটী কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার প্রথমটী হইতেছে—শিশিরবাবু করচার গোবিন্দকে 'কায়স্থ' বলিয়াছেন, অথচ মুদ্রিত করচায় আছে তিনি 'কর্ম্মকার'। আর দ্বিতীয়টী হইতেছে—শিশিরবাবু তাঁহার প্রেস হইতে গোবিন্দদাসের করচা বাহির করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজে ছাপিবেন বলিয়া উহা শিশিরবাবুকে দিতে অস্বীকার করেন।

বনোয়ারীলালের ইতিহাস অনুসারে, শিশিরবাবু এই দুই কারণে রুষ্ট

ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই মতিবাবু করচার মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। আবার সেন মহাশয় বনোয়ারী-লালের এই উক্তির উপর রং চড়াইয়া লিখিয়াছেন,—"যদি গোস্বামী মহাশয় শিশিরবাবুকে করচা ছাপিতে দিতেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশ হইতে পুস্তকখানি বাহির হইত, তবে ইহার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন আন্দোলন হইত না।"(২২) সুতরাং সেন মহাশয়ের মতে, "কি ভাবে করচার বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ আরব্ধ হয়, তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া গেল।" কিন্তু শিশিরবাবুর ন্যায় ব্যক্তি যে এইরূপ নীচতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এ কথা লিখিতে যিনি দ্বিধা বোধ না করেন, তাঁহার মনোবৃত্তি যে কতদূর নীচ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যখন কোন উকিল বা কৌন্সিল বিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খুজিয়া না পান, তখন তাঁহার চেষ্টা হয় নানা রকম অবান্তর কথা বলিয়া সাধারণের নিকট বিপক্ষের পদগৌরব ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করা। এখানেও সেই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। মহাত্মা শিশিরকুমার যে কারণ দেখাইয়া করচার মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা একেবারে অসম্ভব জানিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে কতকগুলি অলীক ও অবিশ্বাস্য উক্তি উঠাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করা হইয়াছে এইমাত্র।

যাহাহৌক বনোয়ারীলাল গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"চৈতন্যকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অদ্বৈতাচার্য্য কঠোর সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্য আমাদের বংশের আত্মীয় হইতেও আত্মীয়—আমাদের বংশের ধ্যান ও ধৃতি। চৈতন্যকে হীনপ্রভ তুমি করিতে পার, কিন্তু অদ্বৈতের বংশধর এমন কাজ করিতে কখনই ধাবিত হইবে না।" (১১)

বনোয়ারীলাল যাহা লিখিয়াছেন, অদ্বৈতের বংশধরদিগের নিকট সেইরূপই আশা করা যায়। কিন্তু বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে,—যে অদ্বৈত চৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতেন, সেই অদ্বৈতের জীবদ্দশায় তাঁহারই পুত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যকে প্রকৃতই হীনপ্রভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে।

বনোয়ারীলাল ইহাই বলিয়া তাঁহার ইতিহাস পরিসমাপ্ত করিয়াছেন যে,—"এই ঘোর কলিযুগে রাত্রিকে দিন প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীর অভাব হয় না।" বনোয়ারীলালের এই উক্তি যে 'সরল সত্য' তাহা "গোবিন্দদাসের করচা-রহস্ত" পাঠ করিলেই প্রমাণিত হইবে।

কালিদাস নাথের কথা

বনোয়ারীলালের "করচা উদ্ধারের ইতিহাস" লিখিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, কালিদাস নাথকে গোবিন্দদাসের করচার প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক বলিয়া খাড়া করা। কারণ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা কোন পুস্তকের মৌলিকতা ও ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিতে হইলে, সেই পুস্তকের প্রাচীন পুথির বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু যে স্থলে প্রাচীন পুথি পাইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই, সেখানে এরূপ একজন লোকের প্রয়োজন যিনি ঐ পুথি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিম্বা কোন স্থান হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কেবল ঐ কথা বলিলেই হইবে না, সমাজে তাঁহার এরূপ পদমর্য্যাদা থাকা আবশ্যক যাহাতে তাঁহার কথার

উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। কাজেই এস্থলে কালিদাস নাথকে করচার প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক বলিয়া উপস্থাপিত করা যে সুবুদ্ধির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

কারণ কালিদাস নাথের বাড়ী ছিল শান্তিপুরে। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি আলোচনা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি 'বৈষ্ণব' নামক একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং "জগদানন্দের পদাবলী" প্রভৃতি কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থও সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন সচ্চরিত্র, মিষ্টভাষী, বিনয়ী প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত বহু সদ্‌গুণ তাঁহার ছিল। এই সকল কারণে বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার বিশেষ সম্মান ও পদগৌরব ছিল। সুতরাং তাঁহাকে করচার প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক বলিয়া উপস্থাপিত করা সদ্বিবেচকের কার্য্যই হইয়াছিল।

আবার অপর পক্ষে কতকগুলি কারণে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কারণ যে সময় কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক করচার প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেসে কার্য্য করিতেছিলেন।

তিনি ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেসের বাঙ্গালা বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ। এই বিভাগ হইতে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈতবংশ্য ৺রাধিকা-নাথ গোস্বামী এবং কলিকাতানিবাসী নিত্যানন্দবংশ্য ৺শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহার যুগ্ম সম্পাদক থাকিলেও, কালিদাস নাথের উপরই ইহার তত্ত্বাবধানের যাবতীয় ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন ও সংগ্রহ করিতেন এবং প্রুফ দেখিতেন। এতদ্‌ভিন্ন মহাত্মা শিশিরবাবুর অমিয়নিমাইচরিত প্রভৃতি বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থাদির প্রুফও তিনিই সংশোধন করিতেন।

এই সময় গোবিন্দদাসের করচার গোড়ার ২।৩ ফর্ম্মার পাণ্ডুলিপি শিশিরবাবুর হস্তগত হয়। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে এই পাণ্ডুলিপি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পড়িতে দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে উহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। করচার গোড়ার পাতাগুলি এইরূপে হারাইয়া যাইবার পর, জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশে আসিয়া শিশিরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পূর্ব্বে শিশিরবাবুদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না। এই সময় হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া শিশিরবাবুর সহিত করচার লুপ্তপত্র-গুলির উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সেই সময় সেখানে কালিদাস নাথের সঙ্গে তাঁহার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইত; এবং এই সময়ই অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশে দীনেশবাবু ও বিশ্বকোষের নগেন্দ্রবাবুর সহিত কালিদাস নাথের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা।

ইহার কয়েক বৎসর পরে (অর্থাৎ ইং ১৮৯৫ সালে) গোবিন্দ-দাসের করচার প্রথম সংস্করণ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার দশ বৎসর পরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ছাপা হইয়াছিল। ইহার সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথের উপর। তখনও কালিদাস নাথ অমৃতবাজার পত্রিকা আফিশে কার্য্য করিতে-ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তক ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোকগমন করেন।

বনোয়ারীলালের ইতিহাসে আছে যে,—করচার পাণ্ডুলিপির প্রথম কতকগুলি পাতা হারাইয়া যাইবার পর, গোস্বামী মহাশয় করচার প্রাচীন পুথিখানি কালিদাসের নিকট পুনরায় চাহিয়া ছিলেন ; কিন্তু কালিদাস

বলিলেন,—যাহার পুথি তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহা পাইবার আর সম্ভাবনা নাই। বনোয়ারীলালের এই উক্তি যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে জয়গোপাল যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কালিদাসের দ্বারা প্রাচীন পুথি পাইবার আশা আদপে নাই, তখন তাঁহার কি করা উচিত ছিল?

গোস্বামী মহাশয়ের তখন যে কোন প্রকারে কালিদাসের উপর এরূপ চাপ দেওয়া আবশ্যক ছিল, যাহাতে পুথিখানি উদ্ধার করা সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং এই কার্য্য উদ্ধারের জন্য এরূপ একজনকে বাহির করা উচিত ছিল, যাঁহার প্রভাব তখন কালিদাসের উপর বিলক্ষণ থাকিতে পারে।

এরূপ এক ব্যক্তিকে বাহির করা জয়গোপালের পক্ষে বেশী কঠিন হইত না। কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে, কালিদাস মহাত্মা শিশির-কুমারের বিশেষ অনুগত ও বাধ্য। তিনি কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে বলিলে তাহা যত কঠিনই হউক না কেন, কালিদাস তাহা উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, আর করচার পুথি যদি একান্তই না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও পুথির মালেকের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। এবং মালেকের নাম ও ঠিকানা পাওয়া গেলে, তখন হারাণো পাতাগুলি নকল করিয়া লইবার জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় শিশিরবাবুর দ্বারা কালিদাসকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ করিবার প্রলোভন কেহই ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

করচার পাতাগুলি হারাইয়া গেলে, গোস্বামী মহাশয় যখন শিশির-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং তাঁহার সহিত তিনি এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তখন কালিদাস নাথ অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশে কাজ করিতেন। অথচ যখন এই নষ্টপত্রগুলি উদ্ধার করা সম্বন্ধে তাঁহারা

একরূপ হতাশ হইয়াছিলেন, তখনও জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কালিদাস নাথকে ঐ সম্বন্ধে অনুরোধ করিবার জন্য শিশিরবাবুকে বলেন নাই। কিন্তু ইহা না বলিবার কারণ কি? হয় ত কেহ বলিতে পারেন যে, সে সময় গোস্বামী মহাশয়ের মনে কালিদাসের কথা আদৌ উদিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালিদাস তখনও অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশে কাজ করিতেন এবং সেখানেই গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত।

সুতরাং কালিদাস নাথকে করচার হারাণো পাতাগুলি উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিবার কথা শিশিরবাবুকে না বলিবার কোনই কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে কি মনে হয় না যে, কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক করচার প্রাচীন পুথি সংগৃহীতের কথা একেবারেই ভিত্তিশূন্য, এবং কালিদাস নাথ মহাশয়ের পরলোকগমনের পর, অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়া এই কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে?

তারপর সেন মহাশয়ও বলিয়াছেন যে, গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে করুণ ভাবে অনেক কথা বলিয়াছিলেন; এমন কি, করচার পাণ্ডুলিপি খোয়া যাইবার পর, পাগলা গোস্বামীর বাড়ী হইতে একখানি খণ্ডিত ও পাঠদুষ্ট পুথি পাইবার কথা তিনি দীনেশবাবুকে বলেন, অথচ কালিদাস নাথের পুথি সংগ্রহের কথা তাঁহাকে না বলিবার কারণ কি? এই আবশ্যকীয় কথাটি যদি গোস্বামী মহাশয় দীনেশবাবুকে বলিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি এই সম্বন্ধে কালিদাস নাথের নিকট সেই সময় অনুসন্ধান করিতেন, এবং পরে তাঁহার ভূমিকায় নিশ্চয় উহা প্রকাশ করিতেন।

দীনেশবাবু যদিও তাঁহার ভূমিকায় অনেক অবান্তর কথা বলিয়াছেন,

এবং একই কথা বহুবার লিখিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাস নাথ যে করচার প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক, এই আবশ্যকীয় বিষয়টি যে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কোন্ দিন শুনিয়াছিলেন, এরূপ কোন আভাসও তিনি ভূমিকায় দেন নাই। ইহাদ্বারা কি মনে হয় না যে আমাদের অনুমান আরও দৃঢ়তর? ফলকথা, গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক গোবিন্দদাসের করচা প্রকাশিত হইবার পর ত্রিশ বৎসরকাল,—অর্থাৎ দীনেশবাবুর প্রকাশিত করচার নব সংস্করণে বনোয়ারী-লালের স্বাক্ষরিত "করচা উদ্ধারের ইতিহাস" বাহির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,—একথা কেহই জানিতেন না যে, কালিদাস নাথই করচার প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন।

আবার, দীনেশবাবুর লিখিত ভূমিকা পাঠ করিলে মনে হয়, কালিদাস নাথ যে করচার প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক, বনোয়ারীলালের এই উক্তির উপর তিনি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন, তবে এই বিষয়ের প্রমাণার্থে তিনি দস্তখত সংগ্রহের জন্য বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারস্থ হইতেন না। এই "দস্তখত-সংগ্রহ-রহস্য" পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আমরা প্রকাশ করিব।

এখানে আর একটি কথা বলিবার আছে। বনোয়ারীলাল বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতৃদেব করচার পুথিখানি পুনরায় পাইবার জন্য কালিদাস নাথকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। গোস্বামী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই কারণে হয়ত তিনি কালিদাস নাথকে সেরূপ দৃঢ়ভাবে ধরিতে না পারায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে বনোয়ারীলালের কি কর্ত্তব্য ছিল না যে, নিজে কালিদাসকে দৃঢ়তররূপে ধরিয়া, করচার প্রাচীন পুথিখানি পুনরায় আনিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা? তিনি ছিলেন সর্ব্বকার্য্যে পিতার দক্ষিণ

হৃত্তস্বরূপ এবং বয়সও তখন তাঁহার ৪০ এর উপর হইয়াছিল। কাজেই তিনি যদি বিশেষ আগ্রহের সহিত কালিদাসকে ধরিতেন, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও, কতক পরিমাণে যে সফলকাম হইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই করেন নাই, এবং ইহা করা যে তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, তাহাও তিনি করচা উদ্ধারের ইতিহাসে উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেই মনে হয়, কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক করচার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে বনোয়ারীলাল এই সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত কালিদাস নাথের বেশ জানা শুনা ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশে কালিদাস নাথ যখন কাজ করিতেন, তখন নগেন্দ্রবাবু ও দীনেশবাবুর সহিত তাঁহার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে যখন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হয়, তখন নগেন্দ্রবাবু ও কালিদাসবাবু এক যোগে উহা সম্পাদন করেন। সেইজন্য তখন তাঁহারা প্রায় একত্রে মিলিত হইতেন। এই সময় গোবিন্দদাসের করচা লইয়া বেশ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। সুতরাং কালিদাস নাথ যদি গোবিন্দদাসের করচা সম্বন্ধে কোন খবর রাখিতেন, তাহা হইলে কোন না কোন সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি নগেন্দ্রবাবুর নিকট করচার কথা উত্থাপন করিতেন। কিন্তু আমরা নগেন্দ্রবাবুর নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, কালিদাস কোন দিন কোন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে গোবিন্দদাসের করচা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে কি মনে হয় না যে, কালিদাস নাথ করচা সংগ্রহ সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতেন না?

আবার কালিদাস নাথ যদি গোবিন্দদাসের করচা কিংবা অপর কোন

প্রাচীন পুথি জয়গোপালকে আনিয়া দিতেন, তাহা হইলে সে কথা শিশিরবাবুর নিকট তাঁহার গোপন করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। কালিদাস নাথ বেশ জানিতেন যে, শিশিরবাবু এই করচা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি আরও জানিতেন যে, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে করচার গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া যাওয়ায়, জয়গোপাল প্রায় পত্রিকা আফিসে আসিয়া শিশিরবাবুর সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। সুতরাং কালিদাস যদি এই করচা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সংবাদ রাখিতেন, তবে তিনি শিশিরবাবুর সন্তোষার্থে সে সংবাদ নিশ্চয় তাহাকে দিতেন। বিশেষতঃ শিশিরবাবুর নিকট করচার পুথি সম্বন্ধে কোন কথা গোপন রাখিবার কোন স্বার্থই কালিদাস নাথের ছিল না।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, কালিদাস নাথ কর্তৃক গোবিন্দ-দাসের করচার প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। গোবিন্দদাসের করচা-রহস্য যাঁহারা অবগত ছিলেন, তাঁহাদের এবং কালিদাস নাথের পরলোকগমনের বহু বৎসর পরে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কালিদাস নাথকে করচার সংগ্রাহক বলিয়া স্থির করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। কালিদাস অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে কার্য্য করিতেন বলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সুবিধা আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে; অপর কাহাকে খাড়া করিলে হয়ত আমাদের অনুসন্ধান করিবার সেরূপ সুবিধা হইত না। সেইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কালিদাস নাথকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনা একটা মস্ত ভুল হইয়াছে।

দস্তখত সংগ্রহ

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এ যুগে দস্তখত সংগ্রহ করা ব্যাপারটা এমন সুলভ হইয়াছে যে, তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই।" দীনেশবাবুর এই কথা যে ধ্রুবসত্য তাহা নিশ্চয়। তবে আমরা অনেক বিষয়ে অপরকে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিয়া থাকি বটে, কিন্তু নিজেদের গরজ উপস্থিত হইলে তখন আর হিতাহিত বোধ থাকে না। দীনেশবাবু ঐ কথা বলিয়া তাঁহার বিপক্ষবাদীদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজেই শেষে সেই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই কার্য্যোদ্ধারের জন্য দীনেশবাবুকে দস্তখত সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এইজন্য তিনি তাঁহার নিজের এবং গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হন। তিনি দুইটি প্রশ্নের উত্তরের প্রার্থী হইয়া তাঁহাদিগকে পত্র লেখেন। ইহার একটি হইতেছে—গোবিন্দদাসের করচা জাল করিবার অভিযোগে শান্তিপুরের বৈষ্ণব-সমাজ কর্ত্তৃক জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় 'একঘরে' হইয়াছিলেন কি না? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হইতেছে—গোবিন্দদাসের প্রাচীন পুথিখানি তিনি গোস্বামী মহাশয়কে নকল করিতে দেখিয়াছিলেন কি না? এবং ইহা কালিদাসের সংগৃহীত পুথি কি না?

তিনি অনুরোধ পত্র কত জনকে দিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কতজন উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তবে এই সম্বন্ধে ছয়খানি পত্র ভূমিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"করচা প্রকাশের ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই পুথি গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। সে আজ ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় কালিদাস নাথ প্রদত্ত পুথি অনেকেই

দেখিয়াছিলেন। তখনকার অনেক লোকই এখন জীবিত নাই। তবে সুখের বিষয় এখনও দু-চার জন শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই পুথিখানি দেখিয়াছিলেন।"

যে কয়েকখানি পত্র দীনেশবাবু ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

(১) বর্দ্ধমান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন সান্ন্যাল মহাশয় দীনেশবাবুকে লিখিয়াছেন,—"আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের করচা 'জাল' করিয়া প্রকাশ করিবার অভিযোগে পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরের বৈষ্ণব-সমাজ কর্ত্তৃক 'একঘরে' হইয়াছিলেন কি না? আমিও এই বৈষ্ণব-সমাজভুক্ত এবং এখন আমার বয়স ৬৩ বৎসর। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বংশপরম্পরা ঘনিষ্টতা চলিয়া আসিতেছে। শান্তিপুরে তিনি যে 'একঘরে' হইয়াছিলেন, একথা আমি কখন শুনি নাই। তাঁহার প্রকাশিত করচাখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা।"

জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ছাপার করচাখানিই তিনি দেখিয়াছিলেন। কালিদাস নাথের সংগৃহীত পুথিখানি তো দূরের কথা, তিনি যে গোবিন্দের করচার প্রাচীন কোন পুথি দেখিয়াছেন তাহাও তিনি লেখেন নাই।

(২) বাকলানিবাসী অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্ক-চূড়ামণি লিখিয়াছেন,—"৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর সন্নিহিত কেওটায় অবস্থানকালে ৺গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক কোন হরিভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট গোবিন্দদাসের করচার পুথি দেখিয়াছিলাম। ঐ পুথিখানি কীটদষ্ট ও জীর্ণ ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐখানি নকল করিতেন, এবং অনেক সময় অস্পষ্ট পদ উদ্ধারের জন্য আমাকে ডাকিতেন। সেইজন্য উহার

অনেক কথা আমার মনে আছে। বর্ত্তমান সময়ে ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সংকলিত গোবিন্দদাসের করচাখানি মুদ্রিত দেখিতে পাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যে পুথি দেখিয়াছিলাম, তাহা ও এই ছাপা পুথি এক বলিয়া মনে করি। জয়গোপাল গোস্বামী সংকলিত পুস্তকখানি যতই পড়িতেছি, ততই আমার পূর্ব্বের লিখিত সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠিতেছে।"

যখন করচা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল, প্রাচীন পুথি দেখিবার জন্য কেহ কেহ সংবাদপত্রেও লিখিতেছিলেন, আর গোস্বামী মহাশয় এই প্রাচীন পুথিখানি প্রাপ্তির জন্য একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন তিনি এই পুথির কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেন মহাশয়ের বিলক্ষণ বাহাদুরী আছে। কারণ ইহার ৪৫ বৎসর পরে, যেই মাত্র তিনি চিঠি প্রচার করিলেন, অমনি সেই প্রাচীন পুথির সন্ধান পাওয়া গেল! আর, তর্কচূড়ামণি মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে, ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, সেন মহাশয়ের নিকট কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিলেন! কিন্তু সেই আন্দোলনের সময় তিনি নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া কোথায় ছিলেন? সে সময় এইরূপ ২।৪ জন সাক্ষী জোগাড় করিতে পারিলে সব গোল ত মিটিয়া যাইত। তবে সেন মহাশয় একটা বিষম ভুল করিয়াছেন। এই কেওটার পুথিখানিই যে কালিদাস নাথের সংগৃহীত সেই প্রাচীন পুথি, তাহা তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন না কেন? তিনি ত অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা প্রমাণ করা আর বেশী কথা কি? যাহাহৌক দীনেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি এই পুথিখানি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

(৩) রংপুরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"শৈশবাবস্থায় আমি পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীকে ভাল রকমই জানিতাম। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের করচার

প্রাচীন পুথি তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। উহা সম্পাদন করিয়া ছাপিবার জন্য তিনি নকল করিতেছিলেন। পুথিখানি তখন জীর্ণ অবস্থায় ছিল।"

শরৎবাবু পণ্ডিত মহাশয়কে যে পুথি নকল করিতে দেখিয়াছিলেন তাহার নাম 'গোবিন্দদাসের করচা' হওয়া অধিক কথা আর কি? তবে এই পুথি তাঁহার কাছে ছিল কিংবা কোথায় পাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য শরৎবাবু জানেন না, এবং উহা যে কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুথি তাহাও তিনি বলেন নাই এবং বলিতে পারেনও না। কারণ গোস্বামী মহাশয় সে কথা কোন দিন কাহাকে বলেন নাই। শিশিরবাবুকে তিনি বলেন যে, ঐ পুথি তাঁহাদের ঘরে ছিল। আবার অন্যান্য লোকের নিকট অন্যান্য রকম কথা বলিয়াছিলেন। একমাত্র বনোয়ারীলালই বলিয়াছেন যে, কালিদাস করচার প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একথাও বলেন যে, তাঁহার পিতাঠাকুর তাড়াতাড়ি উহার নকল করিয়া পুথি কালিদাসকে ফেরৎ দেন। সুতরাং শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা কালিদাসের সংগৃহীত পুথি হইতেই পারে না। বিশেষতঃ জয়গোপাল নিজে কিংবা তাঁহার অন্য কোন পুত্র, অথবা অপর কোন ব্যক্তি কালিদাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথির কথা কোনদিন বলেন নাই।

(৪) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিলাল গোস্বামী মহাশয়ের চিঠিতে জানা যাইতেছে যে, করচার পাণ্ডুলেখা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শান্তিপুরে এখনও জীবিত আছেন।" কিন্তু তিনি জয়গোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারী ও মধ্যমপুত্র মোহন ভিন্ন অপর কাহারও নাম করেন নাই, এবং সম্ভবতঃ তিনি নিজেও ঐ করচা দেখেন নাই, দেখিলে নিশ্চয় তাহা বলিতেন। তারপর তিনি করচার পাণ্ডুলেখার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে তথাকথিত

কালিদাস নাথের সংগৃহীত করচার প্রাচীন পুথি, তাহাও তিনি বলেন নাই। এখানে দীনেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি মোহনের ন্যায় একজন মাতব্বর সাক্ষীর সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করেন নাই কেন?

এখানে আমাদের আর একটি কথা জানিবার আছে। হরিলাল গোস্বামীর সম্পূর্ণ পত্রখানি দীনেশবাবুর একস্থানে প্রকাশ না করিবার কারণ কি? আমরা দেখিতেছি যে, ইঁহার পত্রখানি হইতে তিন টুকরা লইয়া সেন মহাশয় তিনটি বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরে যাঁহাদের পত্র প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বলেন নাই যে, কালিদাস নাথ গোবিন্দদাসের করচার প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেই প্রাচীন পুথিখানি তাঁহারা দেখিয়াছেন। অথচ কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথিখানি যে তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য দীনেশবাবুর এই 'দস্তখত সংগ্রহ' করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। একথা তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন।

(৫) আর এক ব্যক্তিরও সম্পূর্ণ পত্রখানি ভূমিকায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইঁহার নাম কীর্ত্তীশচন্দ্র গোস্বামী। ইনি শান্তিপুরনিবাসী ও তথাকার পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তারপর, ইনি পণ্ডিত মহাশয়ের অতি নিকট-আত্মীয়,—তাঁহার এক দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। সুতরাং দাদাশ্বশুরের অনেক ঘরের খবর তাঁহার জানা সম্ভব। কিন্তু কি জানি কেন, অন্যান্য চিঠিগুলি যেস্থানে যেরূপ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, কীর্ত্তীশচন্দ্রের চিঠিখানি সেস্থানে সেরূপ অক্ষরে না ছাপিয়া, পাদটীকায় অপর একখানি চিঠির সঙ্গে ছোট অক্ষরে ছোট করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পত্রখানি সম্বন্ধে দীনেশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"শ্রীযুক্ত কীর্ত্তীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—আপনার ৫।৪।২৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি। পূজ্যপাদ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দদাসের করচা বাহির করিয়া জালিয়াতীর অপরাধে 'একঘরে' হইয়াছিলেন এরূপ সংবাদ কখন শুনি নাই।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, আসল জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে—অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয় করচার প্রাচীন পুথি কোথায় পাইয়াছেন এবং কালিদাস উহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন কি না তৎসম্বন্ধে—কোন কথা কীর্ত্তীশবাবুর পত্রে নাই কেন? দীনেশবাবু কি এই সকল বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই? সেই আবশ্যকীয় কথা যখন অপর সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন কীর্ত্তীশবাবুকে জিজ্ঞাসা না করিবার কারণ কি? বিশেষতঃ কীর্ত্তীশবাবু গোস্বামী মহাশয়ের অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়, কাজেই তাঁহার নিকটেই এই সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা বেশী। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, দীনেশবাবু হয় ত তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিম্বা কীর্ত্তীশবাবু ঐ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনঃপুত না হওয়ায় তিনি সেই অংশ বাদ দিয়া ছাপিয়াছেন। এই কথা কেন বলিলাম তাহার কারণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

কোচবিহার কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, গোবিন্দদাসের করচা সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে গবেষণা করিবার জন্য তিনি শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে ডাকঘরে কীর্ত্তীশবাবুর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। কীর্ত্তীশবাবু জয়গোপাল গোস্বামীর নাত্‌জামাই, এইকথা শুনিয়া উপেন্দ্রবাবু তাঁহাকে বলেন যে, যদি তিনি তাঁহার দাদাশ্বশুরের নিকট করচা সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়া থাকেন, তবে তাহা বলুন।

কীর্ত্তীশবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তিনি একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"গোবিন্দদাসের করচার প্রাচীন পুথি আপনি কোথায় পাইলেন?" গোস্বামী মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই—

"বর্দ্ধমান জেলার কোন শিষ্যের বাড়ীতে তিনি একখানি প্রাচীন কীটদষ্ট পাঠদুষ্ট জীর্ণ পুথি পাইয়াছিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত ছিল।" সেই পুথির কি হইল?—জিজ্ঞাসা করায় কীর্ত্তীশবাবু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়ের পরলোকগমনের পর তাঁহার গ্রন্থগুলি তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী মহাশয় লইয়া গিয়াছিলেন। যদি থাকে তাঁহার নিকটেই থাকিবে।" উপেন্দ্রনারায়ণ বাবু পরে নবদ্বীপে যাইয়া "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, মোহনলাল বলিয়াছেন, তিনি ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অথচ হরিলাল গোস্বামী লিখিয়াছেন,—এই মোহনলাল কালিদাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন করচাখানি সম্বন্ধে সকল সংবাদ রাখেন! উপেন্দ্রবাবু কীর্ত্তীশবাবুকে কালিদাস নাথ মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার দাদাশ্বশুর মহাশয়ের নিকট কালিদাস নাথের কথা তিনি কখনও শুনেন নাই।

(৬) দীনেশবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"শান্তিপুরনিবাসী আর এক মহোদয় বলিতেছেন,—গোস্বামী মহাশয় পুথির কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। আমিই তাঁহাকে সেই কয়েক পাতা জাল করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। বালক যেরূপ ময়রার দোকানের মিঠাই পাইলে তখনই তাহা গলাধঃকরণ করে, গোস্বামী মহাশয়ও সেই সুপরামর্শটি তখনই গ্রহণ করিয়া ঐ কয়েক পৃষ্ঠা জাল করিয়া ফেলেন।"

দীনেশবাবু যাঁহার উপর ঐরূপ কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাশ; ইনি শান্তিপুরের এণ্ট্রান্স স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র নদীয়া জেলায় সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহাতে জয়গোপাল পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বিশ্বেশ্বরবাবু পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়ছাত্র ছিলেন। তিনি কলেজের পাঠ শেষ করিয়া শান্তিপুর-স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হন এবং ক্রমে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তখনও পণ্ডিত মহাশয় ঐ স্কুলে কার্য্য করিতেছিলেন। এই প্রকারে বিশ্বেশ্বরবাবু বহু বৎসর তাঁহার পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত এই স্কুলে একত্রে কাটাইয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন,—"অবকাশ সময়ে পণ্ডিত মহাশয়কে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনিও স্নেহ ও অনুরাগ সহকারে আমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে ধর্ম্মবিষয়েও তাঁহার সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইত। তখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব আমি কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলাম না। তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভগবদ্ভক্তি এবং অনুপম জীব-হিতৈষিণা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

"চিত্তের যখন এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময় পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয় একদিন আমাকে কহিলেন,—'মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কবিতায় লিখিত একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। তুমি তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয় আনন্দলাভ করিবে।' আমি অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া এই পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলাম। এই পাণ্ডুলিপিই গোবিন্দদাসের করচা। পাণ্ডুলিপির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তাক্ষর। এই হস্তাক্ষর আমার সুপরিচিত ছিল। পাণ্ডুলিপি প্রদানকালে, উহা যে কাহার রচিত সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে

কিছুই বলেন নাই। আমিও তৎকালে এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এরূপ মনে হয় না। যাহাহউক পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম।

"প্রথম কতকগুলি পাতার অভাবে পাণ্ডুলিপি খানি অসম্পূর্ণ ছিল। আমি উহা এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম এবং উহা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি উহার বহুস্থল একখানি ছোট খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। ঐ খাতা অদ্যাপি আমার নিকট আছে। ঐ পাণ্ডুলিপিতে নিবদ্ধ বেদান্ত-সম্মত বহুল উপদেশ আমার হৃদয়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় মৌখিক ভাবেও কখন কখন ঐ সকল উপদেশ আমাদিগকে শুনাইতেন।

"পণ্ডিত মহাশয় ভূচিত্র দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার "চরিত গাথা" নামক পুস্তকে 'ভূচিত্র' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। পণ্ডিত মহাশয় পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ভৌগোলিক বিবরণ গুলি, ভূচিত্র ও ভ্রমণকারীদের মুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল। যাহাহউক পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর, উহার অন্তর্গত উপদেশাবলী এবং উহার ভৌগোলিক বিবরণাদি আলোচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উক্ত পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত মহাশয়েরই রচিত।

"কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, লোক প্রবঞ্চনা করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় উক্ত পাণ্ডুলিপি রচনা করেন নাই, মহাপ্রভুর আদর্শ চরিত লোক সমক্ষে ধারণ করিয়া মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করাই পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেইজন্য গোবিন্দ নামক কোন ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় অতি সরল ও চিত্তাকর্ষক কবিতায় মহাপ্রভুর সমুন্নত চিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া

উপকৃত হইবেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, আজকাল বৈষ্ণবধর্ম্মের যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। আপনার পুস্তকে মহাপ্রভুর চরিত্রটী পরিস্ফুট হইয়াছে। আপনি এই সময় যদি পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন, তবে বৈষ্ণবগণ ও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ অতি আদরের সহিত পাঠ করিবেন।

"পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—'পাণ্ডুলিপিখানি কিছুদিন হইতে অসম্পূর্ণ ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। স্কুল ইনেস্পেক্টর অফিসের হেডক্লার্ক রাণাঘাটনিবাসী যজ্ঞেশ্বর ঘোষকে উহা পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তিনি উহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।' আমি কহিলাম,—'সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানি যখন আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তখন এই পাণ্ডুলিপি বর্জ্জিত কিয়দংশ যদি আপনি রচনা করিয়া দেন তাহাতে ক্ষতি কি?'

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ পাণ্ডুলিপি খানি পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত বলিয়া আমার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল। উহা অপর কাহারও রচিত কিনা তাহা জানিবার জন্যও আমার তৎকালে ঔৎসুক্য হয় নাই। কারণ আমি পুস্তকের গুণেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুতরাং আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আমি পণ্ডিত মহাশয়কে লুপ্ত কয়েক পৃষ্ঠা 'জাল' করিতে বলি নাই, তাঁহারই লিখিত অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বোধে, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম মাত্র। ইহার কিছুদিন পরে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার রচিত 'রত্নযুগল' নামীয় উপন্যাসখানির পাণ্ডুলিপি আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক পাঠ করিতে দিয়াছিলেন।

"এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পণ্ডিত মহাশকে করচার পাণ্ডুলিপির লুপ্ত অংশ সংযোজিত করিতে বলায়, তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না এবং অপরের রচিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি কিরূপে নিজের

রচিত বিষয় সংযোজিত করিবেন এ কথাও আদৌ উল্লেখ করিলেন না। এই সকল কারণে আমি গোবিন্দদাসের করচাকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিজস্ব বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

"কিছুদিন পরে পণ্ডিত মহাশয় একদিন আমাকে কহিলেন,—'বিশ্বেশ্বর করচা সম্পূর্ণ হইয়াছে, উহা ছাপিতে দিয়াছি; শীঘ্রই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত পুস্তকাকারে দেখিতে পাইবে। বাস্তবিকই কিছুদিবস পরে গোবিন্দদাসের করচা মুদ্রিতাকারে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। পাণ্ডুলিপির মৌলিক অংশ এবং পরে সংযোজিত অংশ তুলনা করিয়া, উভয় অংশই আমার একজনের রচনা বলিয়া ধারণা হইল।

"বিশেষতঃ মুদ্রিত পুস্তকে পণ্ডিত মহাশয় কোন ভূমিকা লেখেন নাই। কি সূত্রে, কোথায়, পণ্ডিত মহাশয় উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আদৌ কোন উল্লেখ না থাকায় আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল যে, উহা পণ্ডিত মহাশয়েরই রচিত।

"প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার ভার লইয়া পণ্ডিত মহাশয় কেন উহার ভূমিকা লিখিলেন না, এই কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হইত। পণ্ডিত মহাশয় তৎকালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি গণিত বিজ্ঞান হইতে কাব্য দর্শন প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলে তাহার যে একটি সমীচীন ভূমিকা লেখা আবশ্যক তাহা পণ্ডিত মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। তথাপি গোবিন্দদাসের করচার ভূমিকা কেন পণ্ডিত মহাশয় লিখিলেন না, ইহা বিশেষরূপে আলোচনা করিবার যোগ্য।

"আজকাল অনেকে করচার মূল পাণ্ডুলিপি দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু করচার ১ম সংস্করণে একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কোন ভূমিকা লিখিলেন না, ইহার হেতু কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

"পণ্ডিত মহাশয় অসম্পূর্ণ করচা কেন সম্পূর্ণ করেন নাই, অথবা কেন এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। সম্ভবতঃ করচাখানি সম্পূর্ণ করিয়া মুদ্রিত করিবার অনুকূল সময় ততদিন উপস্থিত হয় নাই। পরলোকগত প্রসিদ্ধ শিশিরবাবুর দ্বারাই আধুনিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, ইহাই আমার বিশ্বাস। উক্ত পুনরুত্থানের পূর্ব্বে করচা মুদ্রিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয় সময়ের গতি বুঝিয়া লোকহিতার্থেই করচার লুপ্ত অংশ সংযোজিত করিয়াছিলেন, মিষ্টান্নলোলুপ বালকের ন্যায় আমার প্রদত্ত সুপরামর্শটি ময়রার দোকানের মিঠাইর ন্যায় প্রাপ্তিমাত্র গলাধঃকরণ করেন নাই।

"পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয়ের পরলোকগমনের পূর্ব্বে করচার প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিবার জন্য আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে কহিলেন,—'আমি উহা রাঢ়দেশে একজন শিষ্যের নিকট পাইয়াছি।' আমি উত্তর করিলাম,—'আমার বিশ্বাস উহা আপনারই রচিত!' ইহাতে তিনি বিরক্তির সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বলাবাহুল্য তখন করচা লইয়া বৈষ্ণবসমাজে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত বা বিষণ্ণ হইতেছেন দেখিয়া আমি ঐ বিষয়ে তাঁহার সহিত আর কোন প্রসঙ্গ করি নাই।"

গ্রন্থকারদিগের সুপারিশ

দস্তখত সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেন মহাশয় গ্রন্থকারদিগের সুপারিশও সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আধুনিক বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ করচাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।" এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি কতকগুলি গ্রন্থকারের নামও উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারা কিভাবে করচাকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছেন তাহাও দেখাইয়াছেন, আর সেই সঙ্গে কতকগুলি গ্রন্থকারকে নানাবিধ বিশেষণে বিভূষিত করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয়নিমাইচরিতের গোটা ৬ষ্ঠ খণ্ডটা গোবিন্দদাসের করচাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন।"

দীনেশবাবুর এই উক্তি একেবারেই ভুল। কারণ অমিয়নিমাইচরিতের তৃতীয় খণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্যচরিত মহাকাব্য প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থাদি হইতে সংকলিত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের করচার নামগন্ধও ইহাতে নাই। ৬ষ্ঠ খণ্ডে মহাপ্রভুর শেষ কয়েক বৎসরের গম্ভীরাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ড আঠার অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে দক্ষিণদেশের কথা কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও প্রধানত চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। তবে গোবিন্দদাসের করচার যে সকল লীলার বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী, সেইগুলি মাত্র উহা হইতে লওয়া হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের পাদটীকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, গোবিন্দদাসের করচা বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা—অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত— এবং শেষের কয়েক পৃষ্ঠা—অর্থাৎ প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে আলালনাথে আসিয়া যে বহু ভক্ত দেখিলেন সেখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত—সমস্তই অলীক। অবশিষ্ট অংশ মোটামুটি প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত মিল আছে। গ্রন্থখানি প্রমাণিক করিবার নিমিত্ত গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে,—"আমি ও কালা কৃষ্ণদাস চলিলাম।" অথচ হস্তলিখিত করচায় কালা কৃষ্ণদাসের নামগন্ধও ছিল না।"

এই পাদটীকায় আরও লেখা হইয়াছে,—"প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া পরে অত্যন্ত লজ্জিত হন। তাহার পর তিনি তাঁহার দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যতদূর সম্ভব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। সে পত্র আমাদের নিকটে আছে।"

(খ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"শ্রীখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার লিখিত "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই করচা হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

কিন্তু "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" পুস্তিকার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই গ্রন্থলিখিত সমস্ত বিষয়ই চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল, চৈতন্যসহস্রনাম, ভক্তিসারসমুচ্চয়, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, প্রাচীন শ্লোক ও মহাজনী পদাবলী প্রভৃতি অবলম্বনে ও গুরুপরম্পরায় অবগত হইয়া লিখিত হইল।" ইহার মধ্যে গোবিন্দদাসের করচার নাম নাই।

(গ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"আধুনিক বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-গৌরবে যে পুস্তকখানি অগ্রগণ্য, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র কৃত সেই সুপ্রসিদ্ধ

"গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে কবচা প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।"

দীনেশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা একেবারেই ভুল। এই গ্রন্থে বহু পরিকর, পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকারের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'গোবিন্দ' নামক কয়েকজন আছেন। ইহাদের সঙ্গে গোবিন্দ কর্ম্মকারের কথাও বলা হইয়াছে, এবং এ কথাও বলা হইয়াছে যে, 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' নামক কোন ব্যক্তি যে মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ সময়ের লীলাকাহিনী সম্বন্ধে কোন করচা লিখিয়াছিলেন, ইহার কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(ঘ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"প্রভুপাদ মুরারীলাল গোস্বামী (অধিকারী) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বৈষ্ণব দিগদর্শনী' গ্রন্থে করচা-লেখক গোবিন্দদাসকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের এই 'দিগদর্শনী' বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রচিত এবং ইনি প্রত্যেক কথাই বিবিধ প্রমাণের সহিত তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়াছেন।"

"করচা-লেখককে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন" ইহা সেন মহাশয় কি অর্থে লিখিয়াছেন বোঝা গেল না। তবে "ইনি প্রত্যেক কথাই যে বিবিধ প্রমাণের সহিত তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়াছেন" একথা ঠিক। কারণ অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের করচা নামক একখানি বহি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বর্ণনানুসারে এই গোবিন্দদাসই মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত করচাকারে লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।" অধিকন্তু করচায় যে সকল নূতন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। সেইজন্য তিনি চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক পুস্তক অনুসারে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলাচল অভিমুখে গমন, এবং

পুরীতে যাইয়া জগন্নাথ দর্শনাদি লীলা তাঁহার 'দিগদর্শনী' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। 'গোবিন্দ ও কৃষ্ণদাস' সহ মহাপ্রভুর দাক্ষিণদেশে যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দ কর্মকারের কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না।" গোবিন্দের করচা যে প্রামাণিক গ্রন্থ একথা মুরারীলাল বাবু তাঁহার পুস্তকের কোন স্থানেই বলেন নাই। সেন মহাশয় 'প্রভুপাদ' ও 'গোস্বামী' বলিয়া তাঁহার তোষামোদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকারী মহাশয় সম্ভবতঃ তাঁহার নামের সহিত এই দুইটী বিশেষণ দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতই হইয়াছেন।

(ঙ) সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদক নবদ্বীপ বুড়াশিবতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী অধুনা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার বিরাট গ্রন্থ নীলাচল লীলার তৃতীয় খণ্ডে তিনি গোবিন্দদাসের করচাকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভুর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক যেখানে যে গ্রন্থ পাইয়াছেন তৎসমুদায় হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরাট গ্রন্থ পূরণ করিয়াছেন। কাজেই গোবিন্দদাসের করচাকে তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। তবে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের সহিত করচার যেখানে মিল নাই সেগুলি করচা হইতে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যে সকল কাহিনী প্রামাণিক অর্থাৎ অন্যান্য গ্রন্থে ও করচায় আছে, এবং করচার বর্ণনা অধিক চিত্তাকর্ষক বোধ হইয়াছে, সেগুলি করচা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও সেন মহাশয় তাঁহাকে 'প্রভুপাদ' ও 'মহাশয়' বলিয়া কেন সম্মানিত করেন নাই তাহা জানি না। তবে সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "যাঁহারা আমার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া করচাকে ধ্বংশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের

মধ্যে এই হরিদাস গোস্বামীর নামও ছিল।" ইহাই কি তবে সেন মহাশয়ের ক্রোধের কারণ ?

(চ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একখানি মানচিত্র প্রকাশিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচাই মানচিত্র খানির মূল অবলম্বন।"

সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা একেবারেই ভিত্তিশূন্য। গোবিন্দ-দাসের করচা যে এই মানচিত্রের মূল অবলম্বন, কিম্বা তিনি যে এই পুস্তক হইতে কোন সাহায্য লইয়াছেন, একথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোথাও বলেন নাই। তিনি ভারতীয় সার্ভে জেনারেলের অফিশে বহুকাল কাজ করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। মানচিত্র অঙ্কিত করাই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য্য। মহাত্মা শিশিরকুমারের অমিয়নিমাই-চরিত পাঠ করিয়াই তিনি মহাপ্রভুর অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীল শিশিরকুমারকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তিনি মহাপ্রভুর তিনবার ভারত-ভ্রমণের তিনখানি পৃথক মানচিত্র আঁকিয়াছিলেন। প্রথমখানি মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা, দ্বিতীয়খানি বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, এবং তৃতীয়খানি বনপথে বৃন্দাবন-গমন। এই মানচিত্র গুলির সঙ্গে ইংরাজিতে এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে বিবরণ মুদ্রিত করেন তাহাতে লেখা আছে যে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে মানচিত্রগুলির বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং সার্ভে অফিশের ভারতবর্ষের প্রাচীন মানচিত্র দেখিয়া উহা আঁকিয়াছেন।* এই মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করিবার

---

* A skeleton map of Hindustan illustrating the directions of the holy travels of Sree Gouranga throughout the main portions of the old Empire of Hindustan,

সময় তিনি ঐপুথি শিশিরবাবুকে দেখাইবার জন্য অনেকবার আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। আমরাও তাহা দেখিয়াছিলাম।

(চ) সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধে কড়চার সপ্রশংস উল্লেখ আছে।"

সেন মহাশয়ের অনেক উক্তিই যখন সঠিক সপ্রমাণ হইতেছে না, তখন তাঁহার এইরূপ ফাঁকা কথায় কেহই ভুলিবেন না। কোন পত্রিকার কোন্ তারিখের ভক্তিনিধি মহাশয়ের কোন্ প্রবন্ধে কড়চার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, তাহা দেখাইয়া না দিলে তাঁহার কথার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ভক্তিনিধি মহাশয়ের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ভিতর ঐরূপ কোন প্রবন্ধ আমরা একেবারেই দেখিতে পাই নাই।

(ছ) সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় মহাপ্রভুর উৎকলে ভ্রমণ বিষয়ক (উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) পুস্তকে কড়চাকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন।"

যাঁহারা সারদাবাবুর পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, দীনেশবাবুর ঐ কথায় সত্যের লেশমাত্রও নাই। সারদাবাবু তাঁহার ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলেন তিনি দাস-স্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাস

based upon Sree Chaitanya Bhagabat & Sree Chaitanya Charitamrita, two sacred standard Baishnab biographies of Chaitanyadev.

Notes—Materials taken from Major James Rennell's first English map of Hindustan—1792 A. D.

গোবিন্দ কামারের নাম উল্লেখ করেন নাই।" আবার তিনি পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দের করচার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করেন উহা আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে গোবিন্দের নামোল্লেখ পর্যান্ত নাই, এবং তাঁহার করচার অনেক স্থলেই আধুনিক রচনার আভাস পাওয়া যায়।" সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর শান্তিপুর হইতে পুরী এবং তথা হইতে দক্ষিণদেশে যাত্রা, যাহা সারদাবাবু তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন। তবে উহার মধ্যে যে সকল স্থানের রচনা করচায় অধিক চিত্তাকর্ষক বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, সেইরূপ কয়েকটী মাত্র ঘটনা করচা হইতে তিনি লইয়াছেন।

বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ

সাধারণতঃ দেখা যায়, যখন কোন উকিল বা কৌন্সিল আপন মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিবার কোন হেতু বা প্রমাণ খুঁজিয়া পান না, তখন তিনি বিপক্ষকে সাধারণের চক্ষে হীন করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। এখানেও আমরা দেখিতেছি, সেন মহাশয় বিরুদ্ধবাদীদিগের সকল কথার ন্যায়সঙ্গত উত্তর দিতে না পারিয়া, তাহাদিগের প্রতি কি প্রকার অসংযত ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি নমুনা এখানে দেখাইতেছি।

(ক) "অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন দু-চার জন লোক ছাড়া আরও এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা কখনই প্রশ্রয়যোগ্য নহেন, কারণ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছেন।" (৩০)

(খ) "একদল সংস্কারান্ধ, অপর দল নানারূপ নিন্দিত উপায় অবলম্বনশীল। এই দুই দলের চেষ্টায় করচার বিরুদ্ধে আন্দোলনটী নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।" (৩৩)

(গ) "দুই একটি অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বাজে বক্তৃতা এবং সংস্কারান্ধ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে উদার বৈষ্ণবসমাজ এই মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থের আদর করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (৩৭)

(ঘ) "প্রতিবাদীরা অনেক মিথ্যার আশ্রয় করিয়াছেন।" (৮২)

(ঙ) সেন মহাশয় যাঁহাদিগের নিকট হইতে "দস্তখত সংগ্রহ" করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরনিবাসী কোন গোস্বামী-সন্তান সত্য কথা বলিতে যাইয়া অপ্রীতিকর কোন কথা বলায়, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য লেখা হইয়াছে,—"কুরুক্ষেত্রের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত 'জ্ঞাতি বিরোধ' আমাদের সমাজে চলিয়া আসিয়াছে।" (২০)

(চ) "পাণ্ডুলিপির দুই ফর্ম্মার অস্পষ্ট স্মৃতি লইয়া শিশিরবাবু করচার বিষয় 'অমিয়নিমাই-চরিত' গ্রন্থে লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং সেই পুস্তকে তিনি স্মৃতিভ্রমের দরুণ গোবিন্দদাসকে 'কায়স্থ' বলিয়া উল্লেখ করেন। তারপর কয়েক বৎসর পরে যখন করচা প্রকাশিত হয়, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মুদ্রিত পুস্তকে গোবিন্দকে 'কর্ম্মকার' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এদিকে তাঁহার অমিয়নিমাই-চরিতের সেই খণ্ড তখন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহার লিখিত কথার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বলিলেন যে করচার প্রথমাংশ অপ্রামাণিক। কিন্তু শিশির বাবুর ন্যায় ব্যক্তি যখন বলিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে 'কায়স্থ' পাঠ ছিল,— 'কর্ম্মকার' পাঠ ছিল না, তখন একদল লোক খুব জোরের সহিত করচার

৫১ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিরোধের উৎপত্তি 'জাতি-মূলক' বিষয় লইয়া।" (২১)

(ছ)• "আর একটি কারণে সম্ভবতঃ এই প্রতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন জয়গোপাল পণ্ডিত মহাশয় করচার পাণ্ডুলিপি লইয়া শিশিরবাবুর নিকট উপস্থিত হন, তিনি তখন এই পুস্তকখানি স্বয়ং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশ হইতে বাহির করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট চাহিয়াছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় তাহা দেন নাই। যদি তিনি দিতেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিশ হইতে পুস্তকখানি বাহির হইত, তবে ইহার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন আন্দোলন হইত না।" (২২)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি 'শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী' স্বাক্ষরিত 'করচা উদ্ধারের ইতিহাস' প্রথমে ছাপিয়া এবং তাহার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া, তৎপরে সেন মহাশয় আপনার মক্কেলের পক্ষ সমর্থনার্থে বিস্তারিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। কাজেই বনোয়ারীলালের স্বাক্ষরিত ইতিহাসে যে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিত মহাশয় যদিও তাঁহার বন্ধুবর সেন মহাশয়কে সরলভাবে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তথাপি তিনি শিশিরবাবুর এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছার কথা বলেন নাই, বলিতেও পারিতেন না; কারণ কথাটি সর্ব্বৈব মিথ্যা। করচার প্রথমাংশ শম্ভু মুখোপাধ্যায় মহাশয় হারাইবার পর অবশিষ্ট অংশ পণ্ডিত মহাশয় শিশির বাবুকে আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মতিক্রমে তিনি উহার নকল করিয়া লইয়াছিলেন। যদি শিশিরবাবুর উহা ছাপিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে তিনি অক্লেশে তাহা করিতে পারিতেন, সেজন্য কাহারও অনুমতি লইবার প্রয়োজন হইত না। করচা ছাপা হইলে মতিবাবু ইহার যে সমালোচনা করেন, তাহাতে কোন অন্যায় উক্তি থাকিলে তখন গোস্বামী মহাশয় নিজে অথবা তাঁহার বন্ধুবরের দ্বারা ইহার প্রতিবাদ

করিতে পারিতেন। তাহা তখন করা হইল না কেন? ইহার জন্য ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল কেন? শিশিরবাবুর স্মৃতিভ্রমের কথা যাহা সেন মহাশয় লিখিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। মক্কেলের স্বার্থসাধনের জন্য সাধারণের নিকট শিশিরবাবুর মর্য্যাদা লাঘবের জন্য ইহা করা হইয়াছে। শিশিরবাবুর স্মৃতিশক্তি কিরূপ প্রবল ছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

(জ) "শান্তিপুরনিবাসী আর এক মহোদয় বলিতেছেন,—গোস্বামী মহাশয় পুঁথির কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, আমিই তাঁহাকে সে কয়েক পাতা জাল করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। বালক যেরূপ ময়রার দোকানের মিঠাই পাইলে তখনই তাহা গলাধঃকরণ করে, গোস্বামী মহাশয়ও নাকি সেই সুপরামর্শটি তখনই গ্রহণ করিয়া ঐ কয়েক পৃষ্ঠা জাল করিয়া ফেলেন।" (২১)

দীনেশবাবু যাঁহাকে উল্লেখ করিয়া ঐ ভাবে শ্লেষ করিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশ্বেশ্বর বাবুর বিশ্বাস যে গোবিন্দদাসের করচা পণ্ডিত মহাশয়েরই রচিত। এই সম্বন্ধে তিনি "সেবা" কাগজে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার উক্তির পোষকতায় যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেন মহাশয় তাহার উত্তর দিতে না পারিয়া, বিশ্বেশ্বরবাবু জাতিতে মোদক বলিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ অভদ্রোচিত ভাষায় বিদ্রূপ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না!

(ঝ) "রায় বাহাদুর রসময় মিত্র লিখিয়াছেন যে তিনি বহুদিন যাবত চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে করচার ভাব ও ভাষার অনৈক্য দেখিয়া উহা 'জাল' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। দৈবক্রমে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার একখানি পুস্তক পাঠ্য করিবার চেষ্টায় রসময়বাবুর নিকট

আসিয়াছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া তিনি গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তক পাঠ্য করিবার লোভ প্রদর্শনপূর্ব্বক করচার অন্ততঃ প্রথমাংশ যে জাল তাহা কবুল করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তদুত্তরে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের যে যে আকার ইঙ্গিত পাইলেন তাহাতে তাঁহার স্পষ্টই ধারণা হইল যে করচার কতকাংশ তিনি জাল করিয়াছেন।"

এই ত গেল সেন মহাশয়ের নিজের সুমিষ্ট সম্ভাষণ। ইহার সহিত তাঁহার সহযোগী মহাশয়ের খিচুড়ি ও পোলাও কিঞ্চিৎ আস্বাদন করুন। তিনি বলিতেছেন,—"রসময় আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, সুতরাং যে সময় করচা বাহির হয় তখন তিনি green horn। তাঁহার বংশের সহিত আমাদের বংশের কোনকালে সখিত্ব ছিল না। যদি পণ্ডিত মহাশয় জাল করিয়া করচা বাহির করিতেন, তাহা হইলে সে কথা সম্বন্ধে পথের আলাপী, গাড়ীর সহযাত্রী রসময়ের নিকট রসোদ্‌গার অবশ্যই করিতেন না। স্বকৃত পাপ প্রচার করিবার জন্য প্রবীণ গোস্বামী রসময়-ডঙ্কা গলায় বাঁধিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, এমন কথা কাহারও বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হইবে না।"

রায় বাহাদুর রসময় মিত্র মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা জানেন তিনি কিরূপ সুশিক্ষিত, সজ্জন ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম তাহা, পাঠ করিলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাইবে।

করচা গোপন রাখিবার কারণ

করচার প্রাচীন পুথি কেন বাহির করা গেল না, তাহার অনেকগুলি কারণ সেন মহাশয় কিরূপ ভাবে পর পর সাজাইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু আসল কথাটি এখনও বলা হয় নাই। তাহাই এখন বলিতেছি।

সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"করচাতে এরূপ একটা আভাষ আছে যে, গোবিন্দ কোন কারণে করচা গোপন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার প্রাচীন পুথি খুব সুলভ হইবে না, এ কথা নিশ্চয়।"

কিন্তু কারণটি না বলিলে লোকে বুঝিবে কি করিয়া, আর বিশ্বাসই না করিবে কেন?—এই কথা মনে উদিত হইবা মাত্র, এই সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। তখন তাঁহার হৃদয়-পটে একটি চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহাতে গোবেচারা গোবিন্দের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। সেই সময় কল্পনাদেবী কতকগুলি কথা তাঁহার হাত দিয়া বাহির করিলেন। কথাগুলি এই—

"যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন শশিমুখী একবার গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়াছিল। পাছে আবার গোবিন্দ শশিমুখীর পাল্লায় পড়েন, এই ভয়ে তিনি করচাখানি সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়াছিলেন।" (৭১)

করচার প্রাচীন পুথি বাহির করিতে না পারিবার অকাট্য প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? কিন্তু করচায় আছে, এই ঘটনাটি হইয়াছিল সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর শান্তিপুর হইতে বর্দ্ধমানে

যাইবার পথে,—সন্ন্যাসের সংকল্প করিয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাইবার সময় নহে। সেন মহাশয় ত্রিশ বৎসর যাবত গোবিন্দদাসের করচা লইয়া যেরূপ গভীর চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের প্রাচীন ব্যাধির পুনরায় প্রকাশ পাওয়া বেশী কথা নহে। ইহাকে অবশ্য "স্মৃতিভ্রম" বলা যায় না।

এই সকল ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও সেন মহাশয় যে একটি অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, তজ্জন্য তিনি যে 'নোবেল প্রাইজ' পাইবার উপযুক্ত, তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। সেই আবিষ্কারটি হইতেছে,—গোবেচারা গোবিন্দ যে শশিমুখীর ভয়ে করচাখানি একেবারে বেমালুম গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার (সেন মহাশয়ের) কল্পনাপ্রসূত নহে;—গোবিন্দ নিজেই তাঁহার করচার এক নিভৃত স্থানে ইহা টুকিয়া রাখিয়াছেন, এবং সেন মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন! ইহা যে সেন মহাশয়ের কথার অকাট্য প্রমাণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন সেই কথাটি শুনুন, যথা—"করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে।" আর গোবিন্দদাসের এই উক্তির অতি সহজ ও সরল অর্থ, সেন মহাশয় পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—সেই অদ্ভুত অর্থটিও শুনুন, যথা—"করচাখানি তিনি সাধ্যানুসারে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" (৪১) আবার অন্যস্থানে এই অর্থটি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন,—অর্থাৎ "করচা তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন নাই।" (৭২)

যাহাহৌক "করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে"—এই কথাটি কোন্ স্থানে বসিয়া এবং কি জন্যইবা গোবিন্দ লিখিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকে হয়ত উৎসুক হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক এই সম্বন্ধে করচায় কি লেখা আছে। বোম্বাই প্রদেশে আমেদাবাদ নামক একটি বড়

সহর আছে। এখানে 'নন্দিনী বাগান' নামক একটি নিভৃত স্থানে বসিয়া গোবিন্দ লিখিয়াছেন—

"না প্যার লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গতে ॥
দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
করচা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া ॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে ॥"

উদ্ধৃত চরণ গুলি পাঠ করিয়া এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, সে দেশের লোকের সকল কথা গোবিন্দ বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য সে দেশের লোকদিগের আকার ইঙ্গিতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং নিজ চক্ষে প্রভুর যে সকল লীলা দেখিয়াছিলেন, আর প্রভুর নিকট ২।৪টি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাই অত্যন্ত গোপনে করচা করিয়া রাখিয়াছিলেন। শশিমুখী আসিয়া পাছে আবার পাকড়াও করে, এ ভাবের কোন কথাই ইহাতে নাই, কিম্বা সে সময় এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই যাহার জন্য তিনি শশিমুখীর ভয়ে করচা সঙ্গোপনে রাখিবার কথা লিখিয়াছিলেন। সেন মহাশয় নিজেই লিখিয়াছেন,—"তৎসময়ে পুরীর পথ সহজ ছিল না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অতি দুর্গম ছিল।" (৪১)

এই কথা যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ পুরীর পথ যদি এইরূপ দুর্গমই হয়, তাহা হইলে আমেদাবাদ—যাহা পুরী অপেক্ষা আরও অধিক দূরে ও অধিক দুর্গম এবং যেখানে শশিমুখীর যাওয়া একেবারেই অসম্ভব,—সেখানে বসিয়া করচা লিখিবার সময়, শশিমুখীর ভয়ে গোবিন্দের করচা গোপন

রাখিবার কথা মনে উদিত হওয়ার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শশিমুখীর ভয়ে করচা গোপন রাখিবার কোন কারণ যদি প্রকৃতই থাকিত, তবে করচার অপর কোন স্থানে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই কেন?—এই কথা যদি কেহ বলেন, সেইজন্য দীনেশবাবু করচার অপর এক স্থানের কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, গোবিন্দ কেবল যে করচা গোপন করার কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, তিনি নিজেকেও গোপন করিয়াছিলেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এখন করচায় পাওয়া যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরিয়া একখানি পত্র সহ গোবিন্দকে শান্তিপুর যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহার একান্ত ভক্ত অনুচরটি কয়েকটি দিনের বিরহ ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন।

"এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।
প্রভুর বিরহ বাণ প্রাণে নাহি সহে॥"

দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"এই কান্নার আর একটি কারণ ছিল,—অর্থাৎ বঙ্গদেশে গেলে শশিমুখী পাছে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করে।" (৭২)

সেন মহাশয় যেস্থান হইতে উল্লিখিত চরণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই স্থানের সমস্ত ঘটনা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে শশিমুখীর ভয়ের কোন আভাস পর্য্যন্তও উহাতে নাই।

সেন মহাশয়ের কল্পনা এখানেই শেষ হয় নাই। তিনি তৎপরে লিখিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই যদি গোবিন্দের মৃত্যু হইত, তবে তাঁহার পরিত্যক্ত জিনিষপত্র খোঁজ করার সময় করচা নিশ্চয় ধরা পড়িত, এবং এই মূল্যবান ইতিহাসের প্রচার তখনই হইত। আর যদি ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দ কাঞ্চননগরের গৃহে যাইতেন,

তবে তাঁহার নিজেকে ও করচাকে গোপন করিবার কোনই কারণ হইত না, এবং তাহা হইলেও করচা প্রসিদ্ধিলাভ করিত।" (৮০)

ইহা হইতে সেন মহাশয় বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা দ্বারা এক সূক্ষ্ম অর্থ আবিষ্কার করিলেন। তিনি বলিলেন,—"করচা যখন গুপ্ত ছিল তখন বুঝিতে হইবে যে, গোবিন্দ সে সময় জীবিত ছিলেন, কিন্তু কাঞ্চননগরে গমন করেন নাই।" অথচ করচা ত প্রায় ৫০০ বৎসর গুপ্ত ছিল, আর জয়গোপাল পণ্ডিত মহাশয়ই উহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, গোবিন্দ এতকাল জীবিত ছিলেন? আর তাহা যদি অসম্ভব হয় এবং গোবিন্দ যদি দীর্ঘজীবী হইয়াও ভবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি যে পরলোকগত হইয়াছেন তাহা নিশ্চয়। তাহা হইলে সেন মহাশয়ের কথা মত সেই সময়েই—অর্থাৎ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দের মৃত্যুর পরই তাঁহার পরিত্যক্ত জিনিষপত্র খোঁজ করিবার সময়—করচা নিশ্চয় ধরা পড়িবার এবং এরূপ মূল্যবান ইতিহাসের প্রচার হইবার কথা।

সেন মহাশয় যখন বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা দ্বারাই স্থির করিয়াছেন, তখন ইহা মিথ্যা হইতে পারে না! কিন্তু যদি তাহাই হইত,—অর্থাৎ যদি গোবিন্দের মৃত্যুর পরই সেই মূল্যবান করচাখানির প্রচার হইত,—তবে তাহা এখন পাওয়া যাইতেছে না কেন? তাহার সমাধানও সেন মহাশয় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে,—"খড়ো ঘরের চালের ফুটা দিয়া বর্ষার দিনে অজস্র জলধারা বর্ষিত হইয়া পুথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে," আর "তাহার উপর এই পুথির বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র চলিয়াছে।" ইহার উপর আর কথা কি?

করচার কথা ত সমাধান হইল। কিন্তু সেন মহাশয়ের মতে, শশিমুখীর ভয়ে গোবিন্দ যে কেবল করচাখানি গোপন রাখিয়াছিলেন তাহা

নহে, তিনি আপনাকেও সামলাইয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? মহাপ্রভু পত্র সহ তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইতে আজ্ঞা করিলেন, এইটুকু করচায় পাওয়া যাইতেছে। তারপর গোবিন্দ যে কোথায় কি ভাবে গমন করিয়াছিলেন, তাহার নিখুঁত বর্ণনা সেন মহাশয়—অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা দ্বারা—কেমন সুন্দর সরল ও সহজ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে।

ছদ্মবেশে গোবিন্দের প্রত্যাবর্ত্তন

দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"গোবিন্দ ত মহাপ্রভুগত-প্রাণ; তাঁহাকে ছাড়া তিনি কায়া ছাড়া ছায়া। কাজেই যে মহাপ্রভু তাঁহার মন-প্রাণ, ধ্যান-জ্ঞান, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কখনই থাকিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে তাঁহার এতাদৃশ অন্তরঙ্গ ভৃত্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহার সঙ্গচ্যুত হইয়া গা ঢাকা দিলেন, একথা আদপে বিশ্বাসযোগ্য নহে।" (৭৭)

এখন গোবিন্দ যে কোথায় গেলেন, তাহা সেন মহাশয় বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা দ্বারা কিরূপ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছি।

সেন মহাশয় বলিতেছেন,—"চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী নামক প্রেমদাসের রচিত একখানি প্রাচীন পুথি আছে। এই পুথিখানি মূলতঃ কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও, ইহাতে কোন কোন অবান্তর কথা আছে। এই পুথিতে লিখিত আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দদাস নামক

একব্যক্তি শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন। এই ব্যক্তি যে শূদ্র তাহার আভাসও পুথিতে আছে। ইনি নিজের বিষয় পর্য্যন্ত গোপন করিয়া চলিয়াছেন, এরূপও বুঝা যায়। তাঁহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—'আমার বাড়ী উত্তর রাঢ়ে।' অবশ্য কাঞ্চননগর উত্তর রাঢ়েরই অন্তর্গত। ইনি নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে' আপনাকে 'বৈদেশিক' বলিয়া জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ড হইতে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন। এবং তৎপরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুনরায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে এই বিবরণটুকু আছে। ইহাঁকে প্রেমদাস 'শ্রীগোবিন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন করচা যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে এই ঘটনা যোগ করিয়া দিলে মনে হয় যেন গোবিন্দদাস যে মহাপ্রভুকর্ত্তৃক শান্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন তৎপরবর্ত্তী খানিকটা বিবরণ পাওয়া গেল।" (১২)

এই আবিষ্কারের জন্য দীনেশবাবু যে ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহাই তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নহে। এইরূপ আবিষ্কার তিনি আরও অনেক করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। তাঁহার আর একটি অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা শুনুন। তিনি বলিতেছেন,—

"চৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয় শিবানন্দ সেন পুরীতে আসিলে, গোবিন্দদাস নামক শূদ্রজাতীয় একব্যক্তি 'আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য' এই পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর সেবাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেবকের মত ভক্ত ও অন্তরঙ্গ মহাপ্রভুর খুব কমই ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব-ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীগোবিন্দ'।" (১৩)

এখানে আমরা জানিতে পারিলাম—শ্রীখণ্ড হইতে যে বৈদেশিক বৈষ্ণব আপনাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া পরিচয় দিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শিবানন্দ সেনের দলে ভিড়িয়া, পুরীতে আসিয়াছিলেন, প্রেমদাস তাঁহাকে 'শ্রীগোবিন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া যে গোবিন্দ পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য গ্রহণ করিলেন, তিনিও বৈষ্ণব ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীগোবিন্দ'।

ইহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা দ্বারা সেন মহাশয় কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা তাঁহার নিজের কথায় শুনুন। তিনি বলিতেছেন,—"একথা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, চৈতন্যকর্ত্তৃক শান্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়া গোবিন্দ তথায় গিয়াছিলেন এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পুরীতে আসিয়া—যে মহাপ্রভু তাঁহার মন-প্রাণ ধ্যান-জ্ঞান তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কখনই থাকিতে পারেন নাই; এবং ঠিক সেই সময় যখন দেখিতেছি যে, ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া এক গোবিন্দদাস (শূদ্রজাতীয়) প্রভুর পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন, তখন আমাদের সহজেই এই ধারণা হয় যে, কাঞ্চননগরের গোবিন্দদাস ভিন্ন মহাপ্রভুর এমন অন্তরঙ্গ ভৃত্য আর কেহই ছিল না, এবং এই দুই গোবিন্দই এক ব্যক্তি, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এই ভাবে তাহার নিজকে ঢাকা দিতে হইয়াছিল।" (১৩)

আমরাও সেন মহাশয়ের সঙ্গে একমত হইয়া বলিতেছি,—ঢাকা না দিয়া আর যে কোন উপায় ছিল না। কারণ শশিমুখী যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিত, তাহা হইলে গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়া কাঞ্চননগরে লইয়া গিয়া নিশ্চয় পচা-গৃহস্থ সাজাইত।

এখানে বিরুদ্ধবাদীরা এক কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? কারণ যাঁহারা এতদিন ধরিয়া গোবিন্দের সঙ্গে একত্রে বসবাস ও মেলামেশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের

মধ্যে কেহই,—এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভু, যিনি দিবানিশি গোবিন্দের সহিত একত্রে কাটাইয়াছিলেন, তিনিও আদপে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না,—এমন কি বেমালুম ছদ্মবেশে গোবিন্দ আপনাকে ঢাকা দিয়াছিলেন'?

অবশ্য তাঁহাদের এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। তবে গোবিন্দদাস যদি সাধন ভজন করিয়া অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সেন মহাশয়ের যে এই সব অলৌকিক ব্যাপারে আদপে আস্থা নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"এই সব অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের ভাবরাজ্যের কথা।" এবং তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি গোঁড়া-বৈষ্ণব নহি, এমন কি বৈষ্ণবই নহি আমি শাক্ত।" (৮১)

যাহা হউক বিরুদ্ধবাদীদের ঐ কথা শুনিয়া কেহ কেহ এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য বাহির হইয়া পড়িল, তাহাতে বোঝা গেল, সেন মহাশয় শূন্যের উপর তাঁহার বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

এই বিষয় লইয়া আমরা এখানে আর অধিক চর্চ্চা করিব না। পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে উল্লিখিত অনুসন্ধানের ফল বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। এই আলোচনা পাঠ করিলে এই বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বারপাল গোবিন্দ ও করচার গোবিন্দ কি একব্যক্তি ?

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"নানাদিক্ দিয়া করচার গোবিন্দদাস ও পুরীর সুবিখ্যাত অনুচর শ্রীগোবিন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।" (১৬) যাহাহোক এই সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্।

তিনি লিখিয়াছেন,—"করচাতে পাওয়া যাইতেছে যে চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরিয়া একখানি পত্র সহ গোবিন্দকে শান্তিপুরে যাইতে আদেশ করেন। এইখানে করচা শেষ হইয়া গেল। ইহার পর করচায় গোবিন্দের আর কোন বিবরণ ছিল কি না তাহা বলা যায় না।" (১২) কিন্তু প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' গ্রন্থে গোবিন্দদাস নামক এক বৈদেশিকের একটি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গোবিন্দই করচা-লেখক গোবিন্দ বলিয়া দীনেশবাবুর ধারণা। তিনি লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ড হইতে শান্তিপুর যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন, এবং তাহার পর শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন,—চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে এই বিবরণটুকু আছে।"

এখন দেখা যাউক, প্রেমদাসের ঐ গ্রন্থে গোবিন্দদাসের বিবরণ কি আছে। এই গ্রন্থের দশম অঙ্কের প্রারম্ভেই আছে যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পরে—

> গুণ্ডিচা যাত্রার কাল প্রত্যাসন্ন হৈল।
> নীলাচল যাইতে সবাই মন কৈল॥

হেনকালে বৈষ্ণব গোবিন্দদাস নাম।
উত্তর রাঢ় হৈতে গেল খণ্ডগ্রাম ॥
নরহরিদাস আদি যত ভক্তগণ।
নরহরি তাঁহারে করিয়া আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসিলা,—"কোথা বাড়ী, কি কার্য্যে গমন ॥"
গোবিন্দ বলেন,—"ঘর উত্তর রাঢ়েতে।
ইচ্ছা হয় মোর শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে ॥
প্রতি বর্ষে তোমরা চলহ নীলগিরি।
তোমা সবে সঙ্গে যাব এই চিত্তে ধরি ॥"
নরহরি বলেন,—"বড় ভাগ্য সে তোমার।
নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার ॥
কিন্তু তুমি শান্তিপুরে চল পুরঃসর।
যেখানে আছেন শ্রীল অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
গৌড়ের বৈষ্ণব সব তাঁর সঙ্গে চলে।
শিবানন্দ সেন পথে সমাধান করে ॥
দেখ যাত্রা তা সভার কতেক বিলম্ব।
পাছে যাব আমরা শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ ॥"

এই কথা শুনিয়া বৈদেশিক গোবিন্দের মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইল। তিনি নরহরির কথা ভাবিতে ভাবিতে শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন। পথে এক মহাযতি বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—তিনি অদ্বৈতের শিষ্য, নাম গন্ধর্ব্ব, বাড়ী শান্তিপুরে। তারপর নিজের নাম ও বাড়ী উত্তর রাঢ়ে বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন; এবং নরহরির নিকট অদ্বৈত ও শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আমি অপরিচিত, আমাকে কি শিবানন্দ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন?" গন্ধর্ব্ব বলিলেন,—"তুমি ত মানুষ, কুকুরেহ শিবানন্দ পালি লঞা গেল।" শেষে বলিলেন,—"তুমি শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট থাক, আমি শিবানন্দের কাছে পুরী যাইবার দিন ও অন্যান্য সংবাদ জানিয়া আসি।" ইহা শুনিয়া—

বৈদেশিক বলে—"ভাই যে আজ্ঞা তোমার।
তোমার অপেক্ষা করি, তুমি লৈলে ভার॥"
গন্ধর্ব্ব গমন কৈল শিবানন্দ ঘরে।
বৈদেশিক রহিলা অদ্বৈত শান্তিপুরে॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে এইখানে বৈদেশিকের কথা শেষ হইয়াছে। ইহার পরে এই গন্থে বৈদেশিক গোবিন্দের আর নামগন্ধও নাই। গোবিন্দ অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি না, এবং শিবানন্দের সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে কোন কথাই ইহাতে নাই। সুতরাং দীনেশবাবু কেমন করিয়া বলিলেন যে, এই সকল কথা প্রেমদাসের পুস্তকে আছে, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

উল্লিখিত পয়ারে এক গোবিন্দদাসের বিবরণ আছে বটে, কিন্তু তিনি যে করচার গোবিন্দ কর্ম্মকার, তাহার কোন প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায় না। এমন কি, বৈদেশিকের বিবরণে, কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে, কি আকার ইঙ্গিতে—সেরূপ কিছুই প্রকাশ পায় না। আর প্রেমদাস যে বৈদেশিককে করচার গোবিন্দ বলিয়া খাড়া করিয়াছেন তাহাও তাঁহার গ্রন্থপাঠে মনে হয় না, এবং ইহাতে এরূপ কোন আভাসও পাওয়া যায় না যে, তিনি পূর্ব্বে কখন মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পুরীতে গিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গোবিন্দ কর্ম্মকার কিংবা তাহার করচা সম্বন্ধে কোন কথা প্রেমদাসের জানিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, কারণ দীনেশবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, গোবিন্দ কর্ম্মকার আপনাকে এবং তাহার গ্রন্থকে বেমালুম

ঢাকা দিয়াছিলেন বলিয়া কেহই ইহা জানিতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই।

আরও একটি কথা। মহাপ্রভু যদি গোবিন্দদাস নামক কোন ব্যক্তিকে কিংবা অপর কাহাকেও পত্র সহ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পাঠাইতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রথমেই যে শান্তিপুরে যাইতেন তাহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ শান্তিপুর ছাড়িয়া প্রথমে শ্রীখণ্ডে যাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কারণ নরহরির নিকট যে সংবাদ জানিবার জন্য গোবিন্দের শ্রীখণ্ডে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা যে শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট পাওয়া যাইত, তাহা তাঁহার না জানিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

যাহাহৌক এই যাত্রায় শিবানন্দ সেন—অদ্বৈতাচার্য্য ও ভক্তগণ সহ—যখন পুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন পথে একস্থানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সে রাত্রি সেখানে থাকা স্থির করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত ছিলেন। তিনি গৌরগতপ্রাণ,—পুরীর এত কাছে আসিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তাই মাতুলের অনুমতি লইয়া অতি প্রত্যুষে দ্রুতপদে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়াই বরাবর প্রভুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই প্রভু সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন (যথা প্রেমদাসের চৈঃ চঃ কৌমুদী গ্রন্থে)—

"কহ দেখি গৌড় হতে কে কে ভক্তগণ।
এ বৎসর নীলাচলে কৈল আগমন॥"

শ্রীকান্ত বলেন,—"যত গৌড়ের ভক্তগণ।
তথা কেহ নাহি, তাঁরা সব এসেছেন ॥
শ্রীচরণ না দেখেন যৈছে কথোজন।
এ বৎসর দেখিতে কৈলা আগমন ॥"

এই কথা বলিয়া শ্রীকান্ত একে একে সকলের নাম করিলেন। এমন কি, শ্রীনাথ নামক এক পরমবৈষ্ণব আসিতেছেন তাহাও বলিলেন, কিন্তু বৈদেশিক গোবিন্দদাসের কোন উল্লেখ করিলেন না।

এদিকে শ্রীকান্ত মহাপ্রভুর নিকটে বসিয়া কে কে আসিয়াছেন তাঁহাদের নাম বলিতেছেন, ও দিকে (যথা চৈঃ চঃ কৌমুদী)—

নীলাচলে স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন।
পরস্পর কথা কহে সুপ্রসন্ন মন ॥
স্বরূপ বলেন,—"শুনিলাম গৌড় হতে।
আসিছে বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে ॥"
গোবিন্দ বলেন,—"সত্য, পথে সবা ছাড়ি।
শ্রীকান্ত আইলা আগে নীলাচল পুরী ॥
স্বরূপ পুছেন,—"কহ, কাহা সে শ্রীকান্ত।
গোবিন্দ কহে,—"প্রভু সনে কহিছে বৃত্তান্ত ॥
স্বরূপ বলেন,—"চল, তথায় যাইব।
গৌড়ের বৈষ্ণব সভা বৃত্তান্ত শুনিব ॥"

ইহাই বলিয়া তাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিলেন। প্রভু তখন শ্রীকান্তের নিকট ভক্তদিগের কথা শুনিতেছিলেন। এমন সময় হরিধ্বনির কোলাহল তাঁহাদের কাণে গেল। ইহাতে ভক্তেরা পুরীতে প্রবেশ করিতেছেন বুঝিয়া—

গোবিন্দেরে কহে প্রভু,—"চল শীঘ্র কর্যা।
জগন্নাথ ভগবৎ প্রসাদ মালা লঞা ॥"

গোবিন্দ বলেন,—"প্রভু, যে আজ্ঞা তোমার।"
মালা লঞা গেল যথা সাধু পরিকর ॥

এই গোবিন্দ কে? ইনি কি প্রেমদাসের বৈদেশিক গোবিন্দ? কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে? স্বরূপের সঙ্গে এই গোবিন্দের যে কথাবার্ত্তা হইল এবং প্রভু তাহাকে মালাচন্দন সহ যে ভাবে পাঠাইলেন, তাহাতে কি মনে হয় না যে, তিনি অনেক দিন প্রভুর কাছে আছেন?

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। দক্ষিণদেশ হইতে পুরী ফিরিয়াই মহাপ্রভু পত্র সহ গোবিন্দ কর্ম্মকারকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের কাছে পাঠাইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ নামক একব্যক্তি আসিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর সেবক বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রভুর অনুমতি লইয়া তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। এতদিন অদ্বৈত প্রভৃতি গৌড়ের ভক্তেরা মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য একবারও পুরীতে আসেন নাই। এইবারই প্রথম তাঁহারা আসিলেন; এবং প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গৌড়ের ভক্তগণকে প্রসাদমালা দিবার জন্য স্বরূপের সঙ্গে গোবিন্দও গেলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু গোবিন্দকে চিনিতে না পারিয়া স্বরূপের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। যথা—

হেনকালে দ্বারপাল গোবিন্দ আইলা।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা লৈঞা হাতে পুষ্পমালা ॥
তাহা দেখে অদ্বৈত জিজ্ঞাসে দামোদরে।
"মালাস্তর লৈঞা কেবা আসিছে গোচরে ॥"
দামোদর বলে,—"এহো গোবিন্দ আখ্যান।
চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহাভাগ্যবান ॥"

আর যে গ্রন্থ হইতে প্রেমদাস তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী বাঙ্গালা

কবিতায় রচনা করিয়াছেন, কবিকর্ণপুরের সেই সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও আছে,—অদ্বৈতাচার্য্য স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দামোদর, পুনর্মালান্তরং গৃহীত্বা কোঽয়মায়াতি।" দামোদর বলিলেন,—"অয়ং ভগবৎ পার্শ্ববর্ত্তী গোবিন্দঃ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পরিষ্কার ভাবে ইহার বর্ণনা আছে। যথা—

তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য, পুছিলা দামোদরে ॥
দামোদর কহেন,—"ইহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিলা।
অতএব প্রভু তারে নিকটে রাখিলা ॥"

এখানে দীনেশবাবু হয়ত বলিবেন,—যখন কবিকর্ণপুর কেবল মাত্র "ভগবৎ পার্শ্ববর্ত্তী" ও প্রেমদাস "চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহাভাগ্যবান্" বলিয়া গোবিন্দের পরিচয় দিয়াছেন, তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাকে "ঈশ্বর-পুরীর সেবক" কি করিয়া বলিলেন? কারণ দীনেশবাবুর মতে,—"কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনেকটা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে হইয়াছিল। তবে রূপ ও সনাতন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকে যে টুকু বলিয়াছিলেন, সে টুকু অবশ্য প্রামাণিক, কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার অপরাপর কথার ঐতিহ্য খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।"

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

চৈতন্যলীলা-রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহাঁ কিছু যে শুনিলুঁ তাহাঁ ইহাঁ বিস্তারিলুঁ
ভক্তগণে দিলুঁ এব ভেটে ॥ ম ২য় ৮৪

* * *

স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহি লিখি, নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩

* * *

রঘুনাথদাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনে লিখি করিয়া প্রতীতি ॥

সুতরাং কেবল রূপসনাতন নহেন, রঘুনাথদাস—যিনি সদা প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন ও যাঁহার কণ্ঠে স্বরূপের চৈতন্যলীলার ভাণ্ডার ছিল—তাঁহার মুখে শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত স্বরূপের করচা, মুরারীগুপ্তের করচা এবং কবিকর্ণপুরের গ্রন্থাদি হইতেও তিনি অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল গ্রন্থ হইতেও যে তিনি অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আর দ্বারপাল গোবিন্দ যে ঈশ্বরপুরীর সেবক তাহা কবিকর্ণপুরের নাটকেও আছে। এই নাটক হইতে প্রেমদাস কবিতায় যাহা অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

হেথা রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেইজন।
নীলাচল আইলা অতি সুপ্রসন্ন মন ॥
বিচার করেন তিহোঁ আপন অন্তরে।
শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠাইলা আমারে ॥
মহাপ্রভুর নিকট প্রস্থান কর তুমি।
তাঁর আজ্ঞা পাইয়া হেতা আইলাম আমি ॥

নিজভাগ্য মহিমা না জানি কিবা হয়।
অঙ্গীকার করেন কি না চৈতন্য দয়াময় ॥
এত বলি প্রভুর নিকটে চলি গেলা।
প্রণমিয়া কৃতাঞ্জলি কহিতে লাগিলা ॥
অবধান কর প্রভু করি নিবেদন।
শ্রীঈশ্বরপুরী মোরে কহিলা যেমন ॥

আর, চৈতন্যচরিতামৃতেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ কথাই বলিয়াছেন। দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে ফিরিবার কিছুকাল পরে একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণসহ বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, (যথা চৈঃ চ মধ্য ১০ম)

হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন ॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তি কালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকটে যাই সেবিহ তাঁহারে ॥

* * *

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিলা অধিকার ॥

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই গোবিন্দ কর্ম্মকারকে পত্রসহ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইতে আজ্ঞা দেন, এই কথা গোবিন্দদাসের করচায় আছে। আর চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে, মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অল্প দিন

পরেই ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবাভার গ্রহণ করেন। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে যে বৈদেশিক গোবিন্দের শ্রীখণ্ডে নরহরির নিকট যাইবার কথা বর্ণিত আছে, উহা হইতেছে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিবার পরের কথা। এই দুই ঘটনার মধ্যে ব্যবধান চারিবৎসরের কম নহে। সুতরাং ঈশ্বরপুরী ভৃত্য (যিনি পরে দ্বারপাল গোবিন্দ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন) এবং করচার গোবিন্দ (যাহাকে দীনেশবাবু বৈদেশিক গোবিন্দ বলি উল্লেখ করিয়াছেন)—এই দুই জন একই ব্যক্তি হইতে পারেন না। তবুও এই দুই গোবিন্দকে এক করিবার জন্য দীনেশবাবু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উপরে কয়েকটি দেখাইলাম। অপর কয়েকটি নিম্নে দেখাইতেছি। যথা—

(ক) দ্বারপাল গোবিন্দের পুরীর পরিচর্য্যা ও করচার গোবিন্দের দাক্ষিণাত্যের মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা—এই দুই পরিচর্য্যার ভাব মিলাইয়া পড়ুন, তাহা হইলে দুই গোবিন্দ যে এক ব্যক্তি সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে। (৭৪)

(খ) আহার্য্য বস্তুর সন্ধান রাখা করচার গোবিন্দের একটা প্রধান প্রচেষ্টার বিষয়। পুরীতে দ্বারপাল গোবিন্দেরও তাহাই। (৭৪)

(গ) মহাপ্রভুর প্রতি আন্তরিকতাও উভয় গোবিন্দের এক রকমের। (৭৭)

(ঘ) উভয় গোবিন্দই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়া বেড়াইতেন। (ঐ)

(ঙ) করচার গোবিন্দ মুরারিদের পল্লীতে তাঁহাকে যাইতে বারণ করিয়াছিলেন, আর দ্বারপাল গোবিন্দ পুরীতে সেবাদাসীর স্পর্শ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঐ)

(চ) দ্বারপাল গোবিন্দ বৈষ্ণব ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীগোবিন্দ", আর বৈদেশিক গোবিন্দকে (ছদ্মবেশে করচার গোবিন্দকে) প্রেমদাস "শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৭৩)

(ছ) আর সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সমতা হইতেছে—উভয়েই শূদ্র! অর্থাৎ উভয়েহ এক —সুতরাং উভয়েই কর্ম্মকার!

দীনেশবাবুর একটি প্রধান যুক্তি এই যে, বঙ্গদেশে আসিয়া গোবিন্দের আত্মগোপন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়,—অর্থাৎ শশিমুখীর নিকট ধরা পড়িবার ভয়ে যদি গোবিন্দ আপন বাড়ীর নাম গোপন করিয়া থাকেন, তবে নিজের নাম গোপন করিলেন না কেন? তাঁহার নাম গোবিন্দ ও বাড়ী উত্তর রাঢ়ে, ইহা শুনিলেও তো শশিমুখীর সন্দেহ হইতে পারে? আর, নাম গোপনকরা তো অতি সহজেই হইত। সুতরাং কেন যে তিনি নিজের নামটি গোপন করিলেন না, তাহার যুক্তি দীনেশবাবুর দেখান উচিত ছিল।

ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোবিন্দ কর্ম্মকার কি ভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহা তো দীনেশবাবু দেখাইলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেবক সাজিয়া, কি প্রকারে গোবিন্দ সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ২৫বৎসর নীলাচলে কাটাইলেন, তাহার কোনরূপ সমাধান করা যে প্রয়োজন, সে কথা কি সেন মহাশয়ের মনে একবারও উদিত হইল না? যাঁহাদের সঙ্গে তিনি এতকাল বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কিছুকালের জন্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আবার যখন তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন কেহই যে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু আসল কথা এই যে,—যে গোবিন্দকে খাড়া করিয়া দীনেশবাবু

দুই গোবিন্দকে এক করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, আদপে সে গোবিন্দের কোন অস্তিত্ব ছিল কি না, তাহা কি দীনেশবাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? আমাদের মনে হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে, নিশ্চয় তিনি এরূপ একটা ভ্রমপ্রমাদ ঘটাইয়া আপনাকে পাঠকের নিকট এরূপ ভাবে হাস্যাস্পদ করিতেন না।

দীনেশবাবুর ন্যায় পাকা ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে কেন আমরা এতবড় একটা কথা লিখিলাম, তাহা বলিতেছি। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী গ্রন্থখানি মূলতঃ কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন অবান্তর কথা ইহাতে আছে।" কথাটি ঠিক। কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটকখানি প্রেমদাস বাঙ্গলা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানিকে আরও অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য তাঁহাকে ইহার স্থানে স্থানে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ কবিতায় অনুবাদ করিবার সময় তিনি আবশ্যক মত ইহাতে নূতন কথা সংযোজিত করিতেও বাধ্য হইয়াছেন।

উদাহরণ দেখাইতেছি। কবিকর্ণপুরের নাটকে আছে যে, গন্ধর্ব্বের প্রশ্নোত্তরে বৈদেশিক বলিতেছেন,—"নরহরিদাসাভিরহং প্রেষিতঃ।" প্রেমদাস সেখানে লিখিলেন,—

"খণ্ডবাসী নরহরি দাস আদি সভে।
মোরে পাঠাইয়া দিলা কার্য্যের গৌরবে॥"

কবিকর্ণপুরের নাটকে নরহরি প্রভৃতির সহিত বৈদেশিকের কথাবার্ত্তার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু প্রেমদাস বিষয়টি আরও অধিক হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য তাঁহার পুস্তকে এই কথাবার্ত্তা গুলি রচনা করিয়া দিয়াছেন।

দীনেশবাবু বলিতেছেন যে, গোবিন্দ আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করিবার জন্য নিজেকে 'বৈদেশিক' বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু কথাটি

আসলে তাহা নহে। প্রেমদাস তাঁহার গ্রন্থে বৈদেশিকের নাম 'গোবিন্দ' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মূল গ্রন্থে—অর্থাৎ যাহা হইতে তিনি অনুবাদ করিয়াছেন কবিকর্ণপুরের সেই নাটকে,—বৈদেশিকের নাম যে 'গোবিন্দ' তাহার কোন উল্লেখ নাই, তাহাতে কেবল 'বৈদেশিক'ই আছে, 'গোবিন্দ' কিম্বা অপর কোন নাম নাই। ইহা কি সেন মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই? তাহা যদি না পড়িয়া থাকে, তবে তাঁহার ন্যায় একজন পাকা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করিলেন কি প্রকারে? ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এখন দেখা যাউক প্রেমদাস এই 'গোবিন্দ' নামটি পাইলেন কোথায়? সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুর কল্পনাবলে তাঁহার নাটকে বৈদেশিকের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কারণ অপর কোন পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। 'গোবিন্দ' নামটিও সেইরূপ প্রেমদাসের স্বকপোল কল্পিত। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিকর্ণপুরের নাটকে বৈদেশিকের কোন নামের উল্লেখ নাই। আর ঘটনাটি সত্য হইলেও, বৈদেশিকের এই 'গোবিন্দ' নামটী অন্য কোন প্রকারে প্রেমদাসের জানিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। কারণ কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটক রচনা শেষ করিয়াছেন ১৪৯৪ শকে, আর ইহার ১৪০ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর শেষলীলাগুলি কতক স্বচক্ষে দেখিয়া, আর কতক তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের ও অন্যান্য পার্ষদ-ভক্তগণের মুখে শুনিয়া, তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রেমদাসের পক্ষে প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানিবার সেরূপ সুযোগ ও সুবিধা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং কবিকর্ণপুর কিম্বা তাঁহার সমসাময়িক অপর কেহ

যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সেই সময়কার নূতন কোন ঘটনা অপর কাহারও নিকট অবগত হওয়া প্রেমদাসের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না ; কাজেই বৈদেশিকের 'গোবিন্দ' নামটী যখন কবিকর্ণপুরের কিম্বা অপর কাহারও পুস্তকে নাই, তখন ঐ 'গোবিন্দ' নামটী প্রেমদাসের যে স্বকপোলকল্পিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই দীর্ঘকালের সঙ্গী, যাঁহাকে বৈষ্ণবেরা 'শ্রীগোবিন্দ' নামে অভিহিত করিয়া সম্মান করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী কোথায়, আর তিনি বঙ্গবাসী এই কথা ঠিক হইলেও, তাঁহার আর কোন পরিচয় কেহ দেন নাই, ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা।" রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট কবিশেখরের ন্যায় উচ্চদরের ঐতিহাসিকের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের কথা হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতেছে বৈষ্ণবদিগের ভাবরাজ্যের ব্যাপার। তাঁহারা সেন মহাশয়ের ন্যায় ঐতিহাসিক ছিলেন না, সুতরাং ঘর বাড়ীর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের খোঁজখবর রাখিবার সময় ও স্পৃহা তাঁহাদের ছিল না। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"অপরাপর সঙ্গীদিগের সকলের পরিচয়ই তো বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।" সকল পার্ষদ-ভক্তদিগের বাড়ীঘরের সংবাদ যে বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে, ইহা দীনেশবাবু জানিলেন কি করিয়া ? চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শাখা-বর্ণনায় অনেক বৈষ্ণবের নাম আছে, কিন্তু তাঁহাদের সকলের বাড়ীঘরের কথা কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে নাই।

আর একটী কথা। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দ আপন বাড়ী কোথায় তাহা গোপন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"উত্তর রাঢ়ে আমি থাকি।" কিন্তু ইহাতে কি মনে হয় যে, তিনি নিজ বাড়ীর কথা গোপন করিবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলেন ? অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, কাহারও

বাড়ী অজানা স্থানে হইলে, তাঁহাকে বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জেলা, মহকুমা কিম্বা নিকটস্থ কোন প্রধান গঞ্জ বা গ্রামের নাম বলিয়া থাকেন।' এখানেও কি সেইভাবে 'উত্তর রাঢ়' বলা হয় নাই?

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এখন ঐতিহাসিক বিচারের যুগ, অন্ধভাবে কোন কথা গ্রহণের দিন চলিয়া গিয়াছে।" আমরাও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছি যে, দীনেশবাবু উচ্চদরের ঐতিহাসিক হইলেও তাঁহার প্রমাণগুলি অন্ধভাবে গ্রহণ না করিয়া, বিচারের নিকষে যাচাই করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা—না মতিচ্ছন্নতা।

নানা জনে নানা রকমে গোবিন্দদাসের করচার গলদ দেখাইয়াছেন। সেন মহাশয়ও তাঁহার লিখিত ভূমিকায় ইহার কতকগুলির সাফাই দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর যেখানে সেরূপ সুবিধা হয় নাই, সেখানে উলটা চাপ দিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিতেছি।

করচার একস্থানে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার নাম 'রুদ্রপতি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একজন এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। দীনেশবাবু নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি ভুলগুলি আকড়াইয়া ধরিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিব, এমন মতিচ্ছন্ন আমার হয় নাই।" (৮০)

দীনেশবাবু এ কথা বলিলেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তিনি মুখে একরূপ বলিতেছেন বটে, কিন্তু কাজে তাহার ঠিক বিপরীত করিতেছেন। এখানেই তাহার জলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। যখন ইহা প্রকৃতই ভুল, তখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের জেদ বজায় না রাখিয়া,

মানিয়া লইলেই তো হইত? তাহাই বলিতেছি, মতিচ্ছন্ন না হইলে তিনি কি লিখিতেন যে,—"তাঁহার যুক্তিটা শাণিত করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের দিকে ফিরাইয়া লউন। উক্ত গ্রন্থের মধ্য-খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে একশত ত্রিশ শ্লোকে—"প্রতাপরুদ্রের" স্থলে গ্রন্থকার "বৰ্দ্ধনরুদ্র" লিখিয়াছেন। এখন যদি একমাত্র এই কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতকে অগ্রাহ্য করা হয়, তবে লেখক কি বলিবেন?" (৬২)

এইরূপ যুক্তিকে মতিচ্ছন্নতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? একটী বালকও যদি ঐ স্থান পাঠ করে, সেও বুঝিতে পারে যে উহা যদি ভুলই হয়, সে ভুল চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকারের হইতেই পারে না। কারণ তিনি উহা তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। উহা হইতেছে রামানন্দ-রায়ের সুবিখ্যাত 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" গীতের শেষ দুই চরণ। যথা—

"বৰ্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান॥"

দীনেশবাবুর মতে "বৰ্দ্ধনরুদ্র" কথাটী ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রাধামোহন ঠাকুর ইহার যে টীকা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—"বৰ্দ্ধনঃ বৰ্দ্ধিষ্ণুঃ রুদ্রগুণেন নরাধিপস্যেব মান ইতি গীত-কর্ত্রাভিমিতম্। পক্ষে শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজেন বৰ্দ্ধিতমানঃ কবির্ভণতি।" অর্থাৎ 'বৰ্দ্ধনরুদ্র' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—বৰ্দ্ধন (বৰ্দ্ধিষ্ণু) রুদ্র-নরাধিপ কর্ত্তৃক মান (সম্মান) যাহার (বহুব্রীহি)। পক্ষান্তরে (পদচ্ছেদ করিয়া) রুদ্রগুণের দ্বারা অর্থাৎ ক্রোধ-ভাব দ্বারা নরাধিপের মানের ন্যায় (শ্রীরাধার) অভিমান বৰ্দ্ধন অর্থাৎ বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।"

সুতরাং বুঝা গেল, ইহা চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ

অথবা পদকর্ত্তা রামানন্দ রায়ের ভুল নহে,—ভুল হইয়াছে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট কবিশেখর মহাশয়ের। পাল্টা চাপ দিতে যাইয়া তাঁহারই মতিচ্ছন্নতা ভাল করিয়া ধরা পাড়িয়াছে।

(খ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"করচাতে সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ মাস পরে চৈতন্যের জটার উল্লেখ আছে। দীর্ঘকালের জন্য পথ পর্য্যটন করিতে হইলে সন্ন্যাসীরা কৃত্রিম জটা ধারণ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। তীর্থযাত্রাকালে কেশ-মুণ্ডনের ব্যবস্থা নাই।" এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব" নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"প্রবাসে তীর্থযাত্রায়াং মাতৃপিতৃবিয়োগতঃ। কচানাং বপনং কার্য্যং বৃথা ন বিকচো ভবেৎ ॥"

এখন দেখা যাউক উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ কি। কিন্তু ইহার অন্বয় ও অর্থ করিবার পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকের মধ্যে একটি কথার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "মাতৃপিতৃবিয়োগতঃ"—পাঠটি ব্যাকরণশুদ্ধ নহে। "মাতাপিতৃবিয়োগতঃ"—প্রকৃত পাঠ বলিয়া আমাদের জানা আছে।

অন্বয়—প্রবাসে, তীর্থযাত্রায়াং, মাতাপিতৃবিয়োগতঃ কচানাং (কেশানাং) বপনং (ছেদনং মুণ্ডনং) কার্য্যং (জনেন)। (জনো) বৃথা বিকচঃ ন ভবেৎ।

অর্থ—প্রবাসে, তীর্থযাত্রায় (প্রয়াগাদিতীর্থে গমন করিলে) এবং মাতাপিতার বিয়োগে (মহাগুরুনিপাতে) কেশ-মুণ্ডন কর্ত্তব্য। বৃথা (অর্থাৎ শুধু শুধু, এই সকল নিমিত্ত ব্যতীত) কেশহীন হওয়া উচিত নহে। [পূর্ণ মস্তক মুণ্ডন উপরি উক্ত কারণ ব্যতীত করিতে নাই।]

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—"দীর্ঘ প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে

জটাধারণের পদ্ধতি রামায়ণের পূর্ব্ব সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। স্বয়ং রামচন্দ্র বনযাত্রার প্রথম দিনেই জটাধারণ করিয়াছিলেন।" ইহাই বলিয়া সেন মহাশয় বাল্মীকি রামায়ণ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং স্থিতঃ। জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।" এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"কৃত্তিবাস রামের এই জটাধারণের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" এখন শ্লোকটির অন্বয় ও অর্থ করা যাউক।

অন্বয়—এবম্ অস্তু। রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞাম্ অনুপালয়ন্, জটাচীরধরঃ (সন্) অহং তু ইতঃ বনং বস্তুং গমিষ্যামি।

অর্থ—(রাম বলিতেছেন) এইরূপই হউক। রাজার (অর্থাৎ দশরথ রাজার) প্রতিজ্ঞাপালন করিতে জটা ও চীরবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বনে বাস করিবার নিমিত্ত আমি এইস্থান হইতে গমন করিব।

অর্থাৎ রাজা দশরথের আজ্ঞা ছিল যে রাম জটা ও চীরবস্ত্র ধারণ করিয়া বনে গমন করিবেন এবং রামচন্দ্র সেই পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে টানিয়া আনা যায় না যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর দীর্ঘ প্রবাস যাত্রায় জটাধারণ করিবার নিয়ম ছিল ও এখনও আছে।

সেন মহাশয়ের এইভাবে আপনাকে হাস্যাস্পদ করিবার কারণ কি ?

(গ) মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে আসিলেন, এবং তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সময় যাঁহারা তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম চৈতন্যভাগবতের মতে—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও গোবিন্দ ; আর করচা অনুসারে—ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর, বাণেশ্বর ও করচার গোবিন্দ। কিন্তু করচায় ছয় জনের নাম থাকিলেও, গোবিন্দ

ভিন্ন আর কাহারও নাম,—শান্তিপুর হইতে পুরীতে পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পথের কোন স্থানেই—করচায় উল্লেখ নাই।

করচার কথা যে সত্য তাহাই দেখাইবার জন্য দীনেশবাবু কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

প্রথমে তিনি বলিয়াছেন,—"এই যে দীর্ঘ পথটা পরিকরবর্গ যাইতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতির উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবনদাস এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।" (১৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

বৃন্দাবনদাস না হয় জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু করচা-লেখক গোবিন্দ চাক্ষুষ দর্শন করিয়া লিখিলেন যে, "ঈশান, প্রতাপ" প্রভৃতি মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, অথচ শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া পুরীতে পৌঁছান পর্য্যন্ত কোন স্থানেই প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দ তাহার করচায় তাঁহাদের নামের কোন উল্লেখ করেন নাই, এবং কি করিয়া তাঁহারা মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইলেন, তাহারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান নাই। আর সেন মহাশয় ত এই সম্বন্ধে একেবারেই নীরব!

তিনি যে কেবল এই সম্বন্ধেই কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই তাহা নহে, বরং ইহার উল্টা গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতগৃহে কিছুকাল অবস্থানের পর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ—অর্থাৎ যাঁহারা চৈতন্যভাগবত অনুসারে মহাপ্রভুর পুরীযাত্রার অনুসঙ্গী ছিলেন তাঁহারা—কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গ বিচ্যুত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু কেবল মুখে বলিলেই ত হইবে না, উহা প্রমাণও করিতে হইবে। কিন্তু সেন মহাশয়ের "মূল্যবান ইতিহাস" গোবিন্দদাসের করচায় ইহার কোন উল্লেখ তিনি খুজিয়া পান নাই। কাজেই তিনি অন্যান্য গ্রন্থ হইতে এই সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন

তাঁহার মনে হইল সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু নিশ্চয় ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, নচেৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গচ্যুত হইলেন কি করিয়া? তখন বহু অনুসন্ধানের পরে নিম্নলিখিত বিষয়টি তাঁহার নজরে পড়িল, যথা—

"চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর দৃষ্ট হয় যে, তিনি প্রবল বায়ুতাড়িত পুন্নাগপুষ্পরেণুর ন্যায় মহাভাব-পরিচালিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকে অনুগমন করিতে পারিতেছেন না।" এই কথা কবিকর্ণপুরের নাটকে পাইয়া সেন মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হুঁস হইল। তিনি দেখিলেন যে, ইহা কাটোয়ার কথা, শান্তিপুর হইতে পুরী অভিমুখে যাইবার সময়ের ব্যাপার নহে।

তখন আর কি করিবেন, কারণ গরজ বড় বালাই। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া তখন তাঁহার সেই জনশ্রুতিমূলক চৈতন্যভাগবতেরই আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায় রহিল না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানিই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার উক্তির পোষকতায় নিম্নলিখিত চরণদ্বয় উক্ত গ্রন্থে পাইলেন। যথা—

"রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥"

ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবর্গ কয়েকদিনের জন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ ছাড়া হইয়াছিলেন। কাজেই সেন মহাশয় তখন সিদ্ধান্ত করিলেন,—"সুতরাং এই পর্য্যটনের সঙ্গী গোবিন্দদাস ভিন্ন আর কেহ সমগ্র পথ মহাপ্রভুর অনুগমন করেন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার স্বগণবর্গের হাত এড়াইবার অতিমাত্র চেষ্টার

দরুণ হয়ত তাঁহারা ঠিক তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। শেষে পুরীতে আসিয়া তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন।" (১৫পৃ পাদটীকা)

এখানে আমরা সেন মহাশয়ের এই সকল উক্তি ও যুক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। তিনি বলিয়াছেন যে—"বৃন্দাবনদাস উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ও দিকে গোবিন্দদাস চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।" কাজেই গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী বলিয়া যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহারাই যে প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন, আর বৃন্দাবনদাস যাঁহাদের কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারা যে যাইতে পারেন নাই, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু করচায় যাঁহাদের নাম প্রভুর অনুসঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া আর কাহারও নাম শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া পুরীতে পৌছন পর্য্যন্ত একবারও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহা প্রমাণাভাব। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের কথা উত্থাপিত না করিয়া সেন মহাশয় যে অতিবুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এই কথা ধামা চাপা দিয়া, তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, বৃন্দাবনদাস যাঁহাদেয় নাম মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী বলিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতি আদপে প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়া যান নাই।

সেইজন্য তিনি লিখিলেন,—"অদ্বৈতগৃহে কিছুকাল অবস্থানের পর নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ কয়েকদিনের জন্য তাঁহার সঙ্গ বিচ্যুত হইয়াছিলেন।" ইহার প্রমাণ গোবিন্দের করচা হইতেই সেন মহাশয়ের দেখান উচিত ছিল। কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন তিনি কথাটি ঘুরাইয়া লইলেন। অর্থাৎ তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে,—প্রভু এরূপ দৌড়িয়া গিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভৃতি—যাঁহাদের নাম বৃন্দাবনদাস উল্লেখ

করিয়াছেন, তাঁহারা—প্রভুর সঙ্গহারা হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রমাণও করচায় পাওয়া গেল না। তখন কবিকর্ণপুরের নাটক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন। কিন্তু শেষে বুঝিতে পারিলেন যে, উহা ঠিক হইল না। কাজেই তখন চৈতন্যভাগবতের কথা—যাহা তিনি জনশ্রুতিমূলক বলিয়া পূর্ব্বে অগ্রাহ্য করিয়াছেন—তাহাই প্রমাণ বলিয়া ধরিতে হইল! ইহা কি বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা,—না মতিচ্ছন্নতার ফল?

এখন দেখা যাউক, তিনি শেষে যাহা প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করিলেন, সেখানে এই সম্বন্ধে কি লেখা আছে। যথা চৈতন্যভাগবতে—

এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতদিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে॥

সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥
রহিলেন অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥

এখানে আমরা পাইতেছি যে, মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদিগের সহিত সুবর্ণরেখায় স্নান করিয়া, নিত্যানন্দ ও জগদানন্দকে সেখানে রাখিয়া, অপর সঙ্গীদিগের সহিত কতক দূর চলিয়া গেলেন। তারপর—

কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥

কিন্তু নিত্যানন্দ তখন কোথায় কি করিতেছিলেন, তাহা শুনুন—

চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্ব্বথায়॥

কখন হুঙ্কার করে কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস্য ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥ ইত্যাদি ॥

অর্থাৎ নিত্যানন্দ তখন জলে পড়িয়া এই কাণ্ড করিতেছেন। জগদানন্দ অনেক কষ্টে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া, নিজে প্রভুর যে দণ্ড বহন করিতেছিলেন তাহা নিত্যানন্দের জিম্মায় রাখিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরের দণ্ড সাবধানে রাখিও, আমি ভিক্ষা করিয়া শীঘ্রই আসিতেছি।" তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি চিন্তিত হইয়া নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দণ্ড ভাঙ্গিল কে?" কিন্তু তাঁহার নিকট কোন পরিষ্কার উত্তর না পাইয়া, তিনি সেই তিন খণ্ড দণ্ড লইয়া নিত্যানন্দ সহ মহাপ্রভু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সুতরাং সেন মহাশয় যাহা প্রমাণ করিবার জন্য "রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র" ইত্যাদি উদ্ধৃত করিলেন, তাহার প্রমাণ ত হইলই না, বরং প্রমাণিত হইল—যাহা সেন মহাশয় জনশ্রুতিমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন,—অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতিই বরাবর প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আদপে ছাড়াছাড়ি হয় নাই। ইহাদ্বারা আরও প্রমাণিত হইল যে, করচায় যাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র গদাধর ভিন্ন আর কেহই গমন করেন নাই। কারণ নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গেও এই গদাধরের নাম আছে। ইহাও কি সেন মহাশয়ের বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা,—না আর কিছু?

এখানে আর একটি কথা বলিবার আছে। দীনেশবাবু যখন ঐ উদ্ধৃত ঘটনাটি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে

তিনি ইহা সত্যমূলক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। সুতরাং তাহা হইলে, এই 'দণ্ডভঙ্গ' কাহিনীটি গোবিন্দের করচায় না থাকিলেও, ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। বিশেষতঃ এই 'দণ্ডভঙ্গ' ঘটনাটি কেবল যে চৈতন্যভাগবতে আছে তাহা নহে, আরও অনেক প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই পুরীতে যাইবার পথে নিত্যানন্দ কর্তৃক এই 'দণ্ডভঙ্গ' কাহিনী বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে।

ঐতিহাসিক প্রামাণিকতায় করচার স্থান

দীনেশবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"মদ্‌রচিত বিবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকে আমি বৈষ্ণব-ইতিহাস-ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের করচার অতি উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি, এমন কি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতেও ঐতিহাসিক প্রামাণিকতায় করচাকে বড় মনে করিয়াছি।" (২৩)

করচাকে ঐতিহাসিক প্রামাণিকতায় উচ্চস্থান দিতে হইলে বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা যে বিশেষ আবশ্যক তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা করিতে হইলে কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা দীনেশবাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিচক্ষণ সাহিত্যিক যে বিলক্ষণ অবগত আছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন দেখা যাউক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া,—অর্থাৎ সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় কি না; তিনি মহাপ্রভুর সহচর ছিলেন কি না এবং থাকিলে কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত ছিলেন; তিনি মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইয়া দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছিলেন কি না এবং যদি যাইয়া থাকেন তবে স্বচক্ষে যাহা যাহা দর্শন করেন তৎসম্বন্ধে কোন 'করচা' করিয়া রাখিয়াছিলেন কি না, এবং সঙ্গে সঙ্গে বা পরে তাহা

কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কি না—ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সেন মহাশয় কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"তিনি (গোবিন্দ) যে মহাপ্রভুর বৈরাগ্যের সময় ও তাহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার (মহাপ্রভুর) সহচর ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, একথা কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।" (৪২) এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহাও তিনি লিখিয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থ ও বলরাম দাসের পদ হইতে গোবিন্দ কর্ম্মকার সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

(ক) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বৈরাগ্য-খণ্ডে চৈতন্য-সহচর গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত আছে। এই জয়ানন্দ মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক।" (৪২)

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে কোন গ্রন্থের দুইখানি প্রাচীন পুঁথিতে পরস্পরে সম্পূর্ণ মিল নাই। হয় মাঝে মাঝে কথা বাদ পড়িয়াছে, না হয় এক কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথা বসিয়াছে। এই সকল ভ্রম-প্রমাদ লিপিকরের অসাবধানতাবশতঃ অথবা ঠিক পাঠ উদ্ধার করিতে না পারিবার জন্যই অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কেহবা পুঁথির কোন অংশ একেবারে পরিত্যাগ করেন, কিম্বা নূতন কিছু বসাইয়া থাকেন। দীনেশবাবুও লিখিয়াছেন,—"প্রায় প্রাচীন পুঁথিতে লিপিকরের প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, তাহা ছাড়া পাঠ উদ্ধার করাও অনেক সময় সুকঠিন। বিশেষ, নাম-শব্দের প্রায়শই অনেক বিড়ম্বনা হয়।" (৭৪)

জয়ানন্দের পুথিতেও এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। দীনেশ-বাবু বলিতেছেন,—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইখানি চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম রহিয়াছে।" এই পুথিদ্বয়ের অপর কোনস্থানে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম বা পরিচয় আছে কি না, এবং এই দুইখানি ভিন্ন এইস্থানে বা অপর কোন স্থানে এই পুথি আর পাওয়া গিয়াছে কি না, এবং পাওয়া গেলে তাহাতে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম ও পরিচয় আছে কি না,—সে সম্বন্ধে দীনেশবাবু কিছুই বলেন নাই। অথচ বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা করিতে হইলে এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

অপর পক্ষে, আমরা সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং আরও ২।১টি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রাচীন পুথিতে "গোবিন্দ কর্ম্মকার" স্থলে "গোবিন্দানন্দ আর" পাঠ দেখিয়াছেন।

কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যখন মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গমন করেন, তখন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে নিত্যানন্দ ও মুকুন্দের সহিত এক গোবিন্দ মহাপ্রভুর অনুগামী হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দের পরিচয় জয়ানন্দের গ্রন্থে নাই। তবে জয়ানন্দের দুইখানি পুঁথিতে তাঁহার নাম "গোবিন্দ কর্ম্মকার," এবং অন্য কয়েকখানিতে "গোবিন্দানন্দ আর" পাওয়া যাইতেছে।

এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের যে গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে যে গোবিন্দ গিয়াছিলেন, তাহার নাম এই ভাবে লেখা আছে—

"মুকুন্দদত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গা পার॥"

কিন্তু তাহার পরে আছে—

"মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হৈল গৌরচন্দ্র॥"

সন্ন্যাসের পর আছে—

"শান্তিপুরে গেল গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।
নবদ্বীপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইঞা॥"

অবশেষে পুরীতে যাইয়া—

"সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিংহদ্বার তলে।"

এখানে শেষের তিনটি পয়ারে আমরা "গোবিন্দানন্দ" পাইতেছি। সুতরাং প্রথম পয়ারেও "গোবিন্দ কর্ম্মকার" না হইয়া "গোবিন্দানন্দ আর" হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আবার প্রথম তিনটি পয়ারে 'মুকুন্দ ও গোবিন্দানন্দ' নামদ্বয় এক সঙ্গে আছে। জয়ানন্দের গ্রন্থে আরও কয়েক স্থানে ও চৈতন্যভাগবতেও 'মুকুন্দ ও গোবিন্দ' একত্রে পাইতেছি।

এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব। সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে জননী ও জন্মভূমি দর্শনার্থে মহাপ্রভু পুরী হইতে গৌড়দেশে গমন করেন। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে, সেই সময় মহাপ্রভু বৰ্দ্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে তাঁহার শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জয়ানন্দ তখন শিশু, এবং তাঁহার নাম ছিল "গুইয়া"। মহাপ্রভু তাঁহার "গুইয়া" নাম ঘুচাইয়া "জয়ানন্দ" নাম রাখেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺কালিদাস নাথ মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার মুখবন্ধে নগেন্দ্রবাবু

লিখিয়াছেন যে,—সম্ভবতঃ ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শকের মধ্যে জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মহাপ্রভু যদি ১৪৩৬ শকে আমাইপুরা যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তখন জয়ানন্দের বয়স ১ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে হইবে; আর মহাপ্রভুর বয়স ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর। ইহার ১৮ বৎসর পরে ৪৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু অপ্রকট হন। সুতরাং সে সময় জয়ানন্দের বয়স ১৯।২০ বৎসর হওয়া সম্ভব। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পূর্ব্বে জয়ানন্দ যে পুরীতে গিয়াছিলেন কিম্বা মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ জয়ানন্দের গ্রন্থে কিম্বা অন্যত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ের যে বর্ণনা তিনি করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া লেখেন নাই;—কতক চৈতন্যভাগবত হইতে লইয়াছেন, আর কতক তাঁহার কল্পনাপ্রসূত।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে, তিনি চৈতন্যমঙ্গল-গীত ৯টি পালায় বিভক্ত করিয়া রচনা করেন, এবং এই পালাগুলি দেশে দেশে নিজে চামর হস্তে গাইয়া বেড়াইতেন। সুতরাং নাটকাদির ন্যায় চৈতন্যমঙ্গলের এই পালাগুলি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে, যাহাতে সাধারণ লোকের মন ইহা শ্রবণে অতিশয় দ্রবীভূত হয়। এইজন্য এই পালাগুলির স্থানে স্থানে নূতন ও অবান্তর কথা সংযোজিত এবং কোন কোন স্থানে প্রকৃত ঘটনা রূপান্তরিত করিতে হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায় যে, মহাপ্রভুর লীলাকাহিনীগুলি মোটামুটি চৈতন্যভাগবত হইতে গৃহীত হইলেও অনেক স্থলেই জয়ানন্দকে কল্পনাদেবীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আরও একটি কথা। গোবিন্দদাসের করচার ন্যায় জয়ানন্দের পুথিতেও এরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত এবং অনেক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যাঁহাদের নাম অপর কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে নাই।

করচা-লেখক যেমন মহাপ্রভুকে বর্দ্ধমানের পথে কাঞ্চননগর দিয়া দামোদর পার করাইয়া কাশীমিত্রের বাড়ী লইয়া গিয়াছেন, এবং সেখানে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করাইয়া, বৈকালে ছুটিতে ছুটিতে হাজিপুরে লইয়া গিয়া, রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য কীর্ত্তন করাইয়াছেন; চৈতন্যমঙ্গল-গীতরচকও সেইরূপ মহাপ্রভুকে "রজনী প্রভাতে, শান্তিপুর ছাড়িঞা, আম্বুআএ" লইয়া গেলেন। সেখানে "আচার্য্য জগন্নাথ, সভাঞি মেলিঞা, করিল শরণ। নানা মহোৎসবে, রজনী বঞ্চিঞা, সুরনদী করিঞা বামে। কাচমণি বেতড়া ডাহিনে থুইঞা, উত্তরীলা কুলীন গ্রামে।" সেখানে গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়, নানা মহোৎসব করিলেন। সেস্থান হইতে "তিন দিবসে চলিলা গৌর কৃপা করিয়া রামানন্দে।" তৎপর "দেবনদ পার হঞা, সেয়াখালা দিঞা উত্তরিলা তমলিপ্তে।" পুরীর পথে অবধূত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়া, ক্রমে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

আবার করচা-লেখক মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় যেমন সেখানে "পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ডচণ্ডেশ্বর" প্রভৃতি ১৪জন পণ্ডিতকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, চৈতন্যমঙ্গল-গীতরচকও সেইরূপ ৩জন ভারতী, ৬জন গিরি, ৯জন পুরী প্রভৃতিকে সেখানে আনিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ইঁহারা উভয়ে এরূপ কতকগুলি মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তের নাম করিয়াছেন, যাঁহাদের নাম অপর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের উভয়ের প্রদত্ত নামের মধ্যেও পরস্পরে কোন মিল নাই।

এরূপ অবস্থায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না, পাঠক তাহা বিচার করিবেন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

(খ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"বৃন্দাবনদাসের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয় চৈতন্যের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে আরও দুই একটী জায়গায় গোবিন্দের উল্লেখ আছে।" (৪৩)

সেন মহাশয় উপরে যে গোবিন্দের কথা বলিলেন, ইনি যে গোবিন্দ কর্ম্মকার তাহার প্রমাণ কি? আমরা চৈতন্যভাগবতে পাঁচজন গোবিন্দের সন্ধান পাইতেছি। যথা—গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ (দ্বিজ) ও দ্বারপাল গোবিন্দ। এই চারিজন ভিন্ন আরও একজন গোবিন্দের উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে আছে। ইহার সন্ধান প্রথম পাওয়া যায়, যখন নিমাইপণ্ডিত একদিন তাঁহার পড়ুয়াগণ সহ রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন। যথা আদি নবমে—

রাজপথে প্রভু আইলেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে,—মহা উদ্ধতের চিন॥

এমন সময়— মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কতদূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
গোবিন্দ বলেন—আমি না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কাজে বা চলিলা কোন ভিত॥

সে সময় নিমাই পণ্ডিতের সবে প্রথমবার বিবাহ হইয়াছে, কাজেই তাঁহার বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। সুতরাং ইহা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। অতএব উপরে যে গোবিন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে, ইনি করচার গোবিন্দ কর্ম্মকার

হইতে পারেন না। কারণ করচায় আছে,—১৪৩০ শকে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ কর্ম্মকার তাহার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া গৃহের বাহির হন এবং নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার সংসারভুক্ত হইয়া যান।

দীনেশবাবু যদিও লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের করচাখানি ৩০বৎসর যাবৎ তাঁহার অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া আছে ও ইহার প্রতি পত্রের উপর তাঁহার শত শত অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে, এবং যদিও এই করচাখানি তিনি বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণার দ্বারা মৌলিক ও ঐতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন,—তবুও এই করচার সকল কথা সম্ভবতঃ তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ছাড়া "চৈতন্যভাগবতে আরও দুই একটি জায়গায় গোবিন্দের উল্লেখ আছে।" (৪৩) এবং ইহার উদাহরণ স্বরূপ পাদটীকায় এই চরণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"দেখি জিজ্ঞাসেন প্রভু গোবিন্দের স্থানে।
ও বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥"

কিন্তু আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দের করচা অনুসারে ইনি গোবিন্দ কর্ম্মকার হইতে পারেন না। দীনেশবাবু আপনার এই উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য হয়ত বলিবেন যে, করচা-লেখক গোবিন্দের গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবার তারিখ ঠিক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লিপিকরের ভুলে তারিখের গোলমাল হইয়াছে; অথবা বলিবেন বৃন্দাবনদাস ঐ ঘটনাটির তারিখ ভুল করিয়া লিখিয়াছেন। এইরূপ ছেলেভুলান যুক্তি দেখাইয়া আপনার কথা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা দীনেশবাবুর যে অভ্যাস আছে তাহা তাঁহার লিখিত করচার ভূমিকা পাঠে বেশ জানা যায়।

উল্লিখিত স্থান ব্যতীত আরও এক জায়গায়,—অর্থাৎ শান্তিপুর হইতে পুরী অভিমুখে যাইবার সময় যাঁহারা মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও—এক গোবিন্দের উল্লেখ আছে। যথা—

"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥ (অন্ত্য ২য় অধ্যায়)

আমাদের মনে হয়, এই কয়েক স্থানে একই গোবিন্দের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং করচা অনুসারে তিনি যে গোবিন্দ কর্ম্মকার হইতে পারেন না, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় এবং সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুর হইতে পুরী যাইবার সময় যে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি যদি অপর কোন গোবিন্দ হইতেন, তাহা হইলে বৃন্দাবনদাস নিশ্চয় তাঁহার গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ করিতেন। আর একটি কথা। আমরা 'মুকুন্দ ও গোবিন্দ' এই নাম দুইটি সর্ব্বদা এক সঙ্গে পাইতেছি; আর গোবিন্দ মহাপ্রভুকে 'পণ্ডিত' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয় শৈশব হইতেই ইঁহারা মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হইয়া ছিলেন।

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী

(গ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে গোবিন্দদাসের একটী বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গোবিন্দই করচা-লেখক বলিয়া আমাদের ধারণা।" (৪৩)

ইহার প্রমাণার্থে তিনি লিখিয়াছেন,—"একথা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, চৈতন্য কর্ত্তৃক শান্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়া গোবিন্দ তথায় গিয়াছিলেন এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।" (৭৩)

আবার—"চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয়, গোবিন্দ শ্রীখণ্ড ও শান্তিপুর ঘুরিয়া শিবানন্দ সেনের দলে প্রবেশপূর্ব্বক পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।" (৭৬)

অন্যত্র—"গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ড হইতে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন এবং তৎপরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুনরায় পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে এই বিবরণটুকু আছে।" (৭৩)

ভূমিকার কয়েক স্থান হইতে আমরা দীনেশবাবুর কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। তিনি ইহাতে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোবিন্দ শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন এবং তৎপরে শিবানন্দ সেনের দলে প্রবেশপূর্ব্বক পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

দীনেশবাবু একজন পাকা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তক তাহার প্রমাণ। তিনি যে বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা করিয়া এই সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে কোন ভুল নাই। গোবিন্দদাসের করচার বিস্তৃত ভূমিকাও তাঁহার ৩০ বৎসরের বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণার ফল। সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে যে কোন ভুলভ্রান্তি নাই তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীর প্রাচীন পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও সেন মহাশয়ের উল্লিখিত উক্তির কোন প্রমাণ উহাতে পাইলাম না। তবে কি ইহা বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা—না ভানুমতীর ভোজবাজী? তাঁহার ন্যায় একজন প্রবীণ ও পাকা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক যদি গবেষণার নাম করিয়া এইরূপ ভেল্কি দেখান, তাহা হইলে খাটি জিনিশ আমরা কোথায় দেখিতে পাইব? তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, প্রেমদাসের কৌমুদী বা কবি-

কর্ণপুরের নাটক কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন না,—ময়রার দোকানের মিঠাই পাইলেই বালকেরা যেমন তখনই তাহা গলাধঃকরণ করে, নাবালক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের দলও তেমনি—তিনি যাহা দিবেন তাহাই—তৎক্ষণাৎ না দেখিয়া না জানিয়া লুফিয়া লইবেন।

দীনেশবাবু অন্যত্র বলিয়াছেন যে,—"প্রেমদাসের এই পুথিখানি মূলতঃ কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও, কোন কোন অবান্তর কথা ইহাতে আছে।" (৭২) একথা ঠিক। কারণ প্রেমদাস তাঁহার কৌমুদী গ্রন্থ অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য অনেক নূতন বিষয় ও নূতন নাম ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। এমন কি, যে বৈদেশিক শ্রীখণ্ডে যাইয়া নরহরির নিকট আপনার নাম "গোবিন্দ" বলিয়াছিলেন, কবিকর্ণপুরের নাটকে তাঁহার 'গোবিন্দ' বা অপর কোন নামের উল্লেখ নাই—তাহাতে তিনি কেবল "বৈদেশিক" বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে "গোবিন্দ" সংক্রান্ত যে সকল বিষয় আছে এবং দীনেশবাবু এই গোবিন্দ ও করচার গোবিন্দকে এক করিয়া ঈশ্বরপুরীর সেবক দ্বারপাল গোবিন্দের সঙ্গে বেমালুম মিশাইয়া দিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য তাহা আমরা "দ্বারপাল গোবিন্দ ও করচার গোবিন্দ কি এক ব্যক্তি?" শীর্ষক প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি।

বলরামদাসের পদ

(ঘ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"প্রায় ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কবি বলরামদাস তাঁহার এক পদে গোবিন্দদাসকে সঙ্গে লইয়া যে চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।" (৪২)

দীনেশবাবু বলরামদাসের যে পদটীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা মহাপ্রভু নাম-প্রচারার্থে নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে যাইবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎসংক্রান্ত পদ। স্বর্গীয় ভদ্রমহাশয় গৌরলীলা বিষয়ক প্রায় দেড়হাজার মহাজনী পদ সংগ্রহ করিয়া, "শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী" নামক যে পুস্তক সংকলন করেন কেবল তাহাতেই এই পদটী আছে। পদকল্পতরু প্রভৃতি যে সকল মহাজনী পদাবলী সংগ্রহ-পুস্তক কিম্বা যে সকল বৈষ্ণব লীলা-গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে কোন পুস্তকেই ঐ পদটী নাই। উল্লিখিত পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈঞা হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
নাম প্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লঞা
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি;

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি ॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোহার সমান তুহুঁ
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল ॥

এই বিষয়ক আরও একটি পদ এই গ্রন্থে আছে। যথা—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম ॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন করিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুঃখ ॥
সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইয়া গৌড়দেশে
পূর্ণ কর সভাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস ॥

বলরামদাস ভণিতাযুক্ত এই দ্বিতীয় পদটী এবং প্রথম পদের প্রথম চারি ছত্র পদকল্পতরুতে আছে। অবশ্য এই চারিছত্রের কোন ভণিতা নাই। ভণিতা নাই বলিয়াই মনে হয় ইহা কোন পদের অংশবিশেষ।

এখন দেখা যাউক 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে প্রকাশিত এই প্রথম পদের প্রথম চারি ছত্রের সহিত অবশিষ্ট ছত্রগুলির ভাবে ভাষায় ও ছন্দে মিল আছে কি না। বলরামদাসের কবিতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি একজন উচ্চদরের ভক্তকবি ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতার ভাষা সরল ও সুললিত, ভাব সুমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী, ছন্দ প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক, উহা পাঠের সময় কোথাও খোঁচখাঁজ পাওয়া যায় না, আর উহার অর্থও অতি সরল ও সহজ। বলরামদাস ভণিতাযুক্ত দ্বিতীয় পদটী এবং প্রথম পদের প্রথম চারি ছত্র যে এক ব্যক্তিরই রচিত, তাহা পাঠ করিলেই বেশ জানা যায়। সুতরাং প্রথম পদের প্রথম চারি ছত্রও বলরামদাসের রচিত বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু প্রথম পদের অবশিষ্টাংশের ভাব ও ভাষা অন্যরূপ, এবং ইহার ছন্দও প্রথম চারি ছত্র ও দ্বিতীয় পদের সহিত সমভাবে রক্ষিত হয় নাই। অধিকন্তু প্রথম পদের শেষাংশ অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ দোষে দুষ্ট। বিশেষতঃ "করিতে তাদের শিব" এই ভাবের কথা কোন বৈষ্ণব-কবি লিখিতে পারেন না। এই শেষাংশ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহা কোন অবৈষ্ণব কাঁচা-কবির কষ্টসাধ্য রচনা। বলরামদাসের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবির স্কন্ধে এইরূপ বালকোচিত রচনা চাপাইয়া দিলে তাঁহার প্রতি বিশেষ অন্যায় করা হয়।

আর একটি কথা। প্রথম পদের অবশিষ্টাংশের মধ্যে আছে—

"নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈঞা
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।"

ইহা পাঠ করিলে মনে হয়, মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যাইবার পূর্ব্বে নিত্যানন্দকে নাম-প্রচারার্থে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কথার প্রমাণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাইয়া মাত্র অল্পদিন ছিলেন, তৎপরে দক্ষিণদেশে গমন করেন। এই সময় পুরীতে অবস্থানকালে তিনি সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মাত্র কয়েক জনকে কৃপা করিয়াছিলেন। সুতরাং দক্ষিণদেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি যে নীলাচল উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং নাম-প্রচারার্থে নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন, একথার প্রমাণ কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে, এমন কি গোবিন্দের করচা বা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও নাই। আর একটি কথা। মহাপ্রভু গৌড়দেশে যাইবার জন্য নিত্যানন্দকে যখন অনুরোধ করিতেছেন, সে সময় 'গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া' তিনি দক্ষিণদেশে যাইবেন, এ কথা বলা মোটে খাপ্ খায় না। তারপর পরবর্ত্তী কোন ভক্তের মুখে শুনিয়া অথবা কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া হয়ত তিনি উক্ত পদদ্বয় রচনা করিয়াছেন, ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু কোন ভক্তের মুখে শুনিয়া তিনি যে ঐ পদদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অপরপক্ষে আমরা দেখিতেছি, মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারিগুপ্তের রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্" নামক সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ "মুরারিগুপ্তের করচা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ৪র্থ প্রক্রমের ২১শ সর্গে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দকে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত গৌড়দেশে পাঠাইবার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহা পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে, বলরামদাস মুরারিগুপ্তের এই পুস্তক দেখিয়াই তাঁহার পদ রচনা করিয়াছিলেন। এমন কি, অনেক স্থলে উভয়ের কথাতেও বেশ মিল আছে। যথা মুরারিগুপ্তের করচা—

নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্।
প্রাহ স গদ্‌গদং যাহি গৌড়দেশং ত্বমীশ্বরঃ॥
মূর্খনীচজড়ান্ধাখ্যা যে চ পাতকিনোঽপরে।
তানেব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ॥

তথা বলরামদাসের পদ—

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্ম জন্ম ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সভাকার দুঃখ॥

সুতরাং মুরারিগুপ্তের করচা অবলম্বন করিয়া বলরামদাস কেবল যে তাঁহার এই পদটী রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, ইহাতে আরও জানা যাইতেছে যে, "বিরলে নিতাই পাঞা" প্রভৃতি চারিটি ছত্র এবং

"প্রভু কহে নিত্যানন্দ" ইত্যাদি ছত্রগুলি একই পদের দুই অংশ। সম্ভবতঃ কোন লিপিকর নকল করিবার সময় ইহা দুইটী পদে বিভক্ত করিয়া থাকিবেন; এবং এইরূপ নকলের নকল তস্য নকল হইতেই "পদকল্পতরু" পুস্তক প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। তারপর সেই মুদ্রিত পুস্তক হইতেই পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি ছাপা হইতেছে। কিন্তু এই ভুল এ যাবৎ কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও মুরারিগুপ্তের করচা হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে, তাহা মিলাইয়া পাঠ করিলেই আমাদের এই উক্তি যে ঠিক তাহা জানা যাইবে।

এখন কথা হইতেছে, "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে প্রথম পদের শেষাংশ অর্থাৎ—"নাম প্রেম বিতরিতে" ইত্যাদি চরণগুলি কোথা হইতে আসিল? মুরারিগুপ্তের করচায় ঐ ভাবের কোন কথার যে উল্লেখ নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এবং অন্য কোন গ্রন্থেও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিশেষতঃ অপর কোন গ্রন্থে থাকিলে দীনেশবাবু যে তাহা তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কারণ বহুকাল হইতেই তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

আর, বলরামদাসের ন্যায় উচ্চদরের ভক্তকবির পক্ষে, এরূপ অবৈষ্ণবী ভাষায় ও ভাবে পদরচনা করা যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা যাঁহারা বৈষ্ণব-পদাবলী আলোচনা করেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ ঐরূপ কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া, একই ভাবের দুইটী বিভিন্ন পদ রচনা করা, কেবল বলরামদাসের ন্যায় উচ্চদরের কবি কেন, কোন পদকর্ত্তার পক্ষেই সম্ভবপর নহে।

"গৌরপদ-তরঙ্গিণী" আধুনিক গ্রন্থ। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহোদয় ১৮৯৪ সালে এই গ্রন্থের জন্য গৌরলীলাবিষয়ক মহাজনী-পদ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি পাবনা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেছিলেন। সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রধান শিক্ষকদিগের এত অধিক সময় দিতে হয় যে, তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যে মনোযোগ দিবার কিংবা হস্তক্ষেপ করিবার সময় ও সামর্থ্য একরূপ থাকে না বলিলেই হয়। এইরূপ অসুবিধার মধ্যে ভদ্র মহাশয়কে দেড়হাজার পদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থা যে সেরূপ সচ্ছল নহে, তাহা সকলেই জানেন। জগদ্বন্ধুবাবুর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই এই পুস্তক ছাপিবার ব্যয় পাঁচশত টাকার জন্য তাঁহাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। একে সময় সংক্ষেপ, তারপর অর্থের অনাটন,—এই দুই কারণে পদসংগ্রহের জন্য তাঁহার অপরের সাহায্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

আবার, বিনামূল্যে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করা সুকঠিন বলিয়া, অনেকে পদাবলীর পুথি নকল করিয়া পাঠাইতেন। এই সমস্ত সংগৃহীত পদাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করা এবং প্রেসে দিবার মত করিয়া সম্পাদন করা, সহজসাধ্য নহে। সুতরাং ২।৪ জন বন্ধুবান্ধবের নিকট কিছু কিছু সাহায্য পাইলেও, অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহার নিজের বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। সেইজন্য এই সকল কার্য্যে যেরূপ মনোনিবেশ করা প্রয়োজন তাহা তিনি করিতে পারেন নাই।

এই সকল কারণে "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে নানা প্রকার ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। একটা মারাত্মক ভুলের কথা বলিতেছি। জগদ্বন্ধু বাবুর বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, এই গ্রন্থে প্রাচীন পদাবলী ভিন্ন, আধুনিক পদ আদপে ছাপিবেন না। কিন্তু পুস্তক মুদ্রিত হইবার পর জানা গেল যে, "সঙ্কর্ষণ" ভণিতাযুক্ত কয়েকটি আধুনিক পদ এই গ্রন্থে বাহির হইয়াছে। এই পদগুলি সম্বন্ধে জগদ্বন্ধুবাবুর প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল,

কিন্তু সময়াভাবের জন্য পুস্তক ছাপা হইবার পূর্ব্বে তিনি বিশেষরূপে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই,—প্রেরকের কথার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই তিনি উহা ছাপিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থে অন্যান্য অনেক রকম ভুলভ্রান্তিও রহিয়া যায়।

যে সময় এই সকল পদ সংগৃহীত হইতেছিল, তখন গোবিন্দদাসের করচার মৌলিকতা লইয়া বেশ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। হয়ত সেই সময় কাহারও মাথায় একটা খেলার চাপে, এবং তিনি করচার গোবিন্দকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য, উল্লিখিত চারি ছত্র কবিতার সহিত যথাসম্ভব মিল রাখিয়া এবং বলরামদাসের ভণিতা দিয়া, অনেক কষ্টে কয়েকটী ছত্র রচনা করেন, এবং শেষে অন্যান্য সংগৃহীত পদসহ উহা জগদ্বন্ধুবাবুর নিকট পাঠাইয়া থাকিবেন; এবং সম্ভবতঃ ইহা ভদ্রমহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া পুস্তকে বাহির হইয়া যায়। পুস্তক যখন বাহির হয়, তখন তিনি নানারূপ বিপদগ্রস্ত ও নিজে অসুস্থ হইয়া পড়ায়, পুস্তকের কাপি সম্পাদন ও প্রূফ সংশোধন করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও শেষে পুস্তক ছাপা হইবার কিছুদিন পরেই তিনি পরলোকগত হন। ইহা যদি সময় মত তাঁহার নজরে পড়িত, তাহা হইলে তিনি এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কখনই ছাপিতেন না বলিয়া আমাদের ধারণা। এইরূপ একটা কিছু না হইলে, এই বেখাপ্পা পদটি রচিত ও পুস্তকে প্রকাশিত হইবার আর কোনই কারণ দেখা যায় না।

করচার রচয়িতা কে?

গোবিন্দদাসের করচা কাহার রচিত তাহা লইয়া আন্দোলন আলোচনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার সঠিক সমাধান অদ্যাপিও হয় নাই। গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত পুস্তকখানির নাম "গোবিন্দ দাসের করচা"। পুস্তকের মধ্যেও আছে যে গোবিন্দ কর্ম্মকার বলিতে-ছেন, তিনি মহাপ্রভুর সহচররূপে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং তিনিই মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশের ভ্রমণকাহিনী করচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের করচাখানি ৩০ বৎসর যাবৎ আমার অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া আছে। ইহার প্রতি পত্রের উপর আমার শত শত অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ যে দিন প্রথম পড়িয়া-ছিলাম, সে আমার এক স্মরণীয় দিন। সে দিন আমার কর্ণে যে দেবলীলার গীতি শ্রুত হইয়াছিল, তাহার রেশ এখনও বাজিতেছে। করচা আমাকে চৈতন্যপ্রভুর যে স্বরূপ দেখাইয়াছে, অন্যত্র কোথায়ও তাহা পাই নাই। এই পুস্তক আমার নিকট মহাপ্রভুর পাদপিঠের বেদী-স্বরূপ॥" (৮১)

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, তিনি শাক্ত; সুতরাং তিনি দাস্যভক্তির অনুরাগী। সেই দাস্যভক্তির সুন্দর চিত্র তিনি এই করচায় পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উল্লিখিত উচ্ছ্বাস যে অকৃত্রিম তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় গোবিন্দ কর্ম্মকারের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক টান্ থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এখন যদি প্রমাণিত হয় যে, এই করচা গোবিন্দদাসের রচিত নহে,—ইহা আধুনিক গ্রন্থ,—তাহা হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাসের উপর যে দারুণ আঘাত লাগিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই;

আর সে আঘাত সহ্য করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন। এরূপ অবস্থায় গোবিন্দ কর্ম্মকারকে এই করচার রচক বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যদি প্রাণপণে চেষ্টা করেন তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

করচাখানি যাঁহারই রচিত হউক, আমাদের ধারণা, ইহার ভাষা, কবিতা ও বর্ণনা যিনিই পাঠ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন।

স্বর্গীয় মতিবাবু তাঁহার লিখিত সমালোচনায় লিখিয়া গিয়াছেন,— "আমার অগ্রজ শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় করচার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া এরূপ বিমোহিত হন যে, ইহা বারম্বার পাঠ করিয়া তিনি ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কাহিনীগুলি একরূপ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন।"

মতিবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহার একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে। শিশিরবাবুর তখন নবানুরাগের অবস্থা। সুতরাং মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী তিনি যেখানে যাহা পাইতেন, তাহাই একমন একপ্রাণে বিভোর হইয়া পাঠ ও আস্বাদন করিতেন।

কাজেই করচার পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ যখন শিশিরবাবুর হস্তগত হইল, এবং যখন তিনি শুনিলেন যে শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে এই পুথি আছে, তখন তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল, তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ইহা মৌলিক কি আধুনিক গ্রন্থ সে কথা তাঁহার মনে একবারও তখন উদিত হইল না। তিনি পাইবামাত্র ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর স্নানের সাজসজ্জা, সঙ্গীদের সহিত তাঁহার জলকেলি, তাঁহার বাড়ীর বিবরণ, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ইত্যাদি বিষয়গুলির সুন্দর বর্ণনা পাঠ করিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। এবং এই অংশ হারাইয়া যাইবার পর গোস্বামী মহাশয় যখন শিশিরবাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন ঐ অংশ তাঁহার নিকট আর নাই শুনিয়া

শিশিরবাবু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং উহার অবশিষ্টাংশ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া নকল করিয়া রাখিলেন। কারণ তাঁহার ভয় হইল পাছে এই অবশিষ্টাংশও হারাইয়া যায়।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয়ছাত্র ও পরে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর বাবু প্রায় ৪০ বৎসরকাল পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত একত্রে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র ও সহকর্ম্মীরূপে কাটাইয়াছিলেন। করচার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের কথায় জানা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"তখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব আমি কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলাম না। তবে তাঁহার অমানুষিক ভগবদ্ভক্তি এবং অনুপম জীব-হিতৈষিণা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। চিত্তের যখন এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময় পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে একদিন কহিলেন,—'মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কবিতায় লিখিত একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। তুমি তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয় আনন্দলাভ করিবে।' আমি অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া সেই পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলাম। প্রথম কতকগুলি পাতার অভাবে পাণ্ডুলিপি খানি অসম্পূর্ণ ছিল। তবুও আমি উহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। উহা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি উহার বহু স্থল নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

ইহা পাঠ করিয়া জানা যাইতেছে যে, বিশ্বেশ্বরবাবুরও তখন নবানুরাগের অবস্থা। সুতরাং শিশিরবাবুর ন্যায় তিনিও গোবিন্দদাসের করচার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, সরলভাষা ও সুললিত কবিতা পাঠ করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক গোবিন্দ কর্ম্মকারের পক্ষে এরূপ পুস্তক রচনা করা সম্ভবপর কিনা। করচার প্রারম্ভেই গোবিন্দ কর্ম্মকারের একটি মোটামুটি

পরিচয় দেওয়া আছে। যাঁহারা করচাকে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা গোবিন্দদাসের এই পরিচয় অবশ্য সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। ইহা পাঠে জানা যায় যে, গোবিন্দ কর্ম্মকার জাতীয়-ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন কি না, আর জানিলেও সে কিরূপ, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ করচায় পাওয়া যায় না।

তবে করচা হইতে একটি বিষয় জানা যাইতেছে। গোবিন্দের স্ত্রী শশিমুখী তাঁহাকে নির্গুণ মূর্খ বলিয়া গালি দেওয়ায়, গোবিন্দ অত্যন্ত *অপমান বোধ করেন*, এবং মনের উত্তেজনায় গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমাদের মনে হয়, যদি করচার ন্যায় পুস্তক লিখিবার মত বিদ্যা ও সেইরূপ মনের অবস্থা গোবিন্দের থাকিত, তাহা হইলে তিনি স্ত্রীর তিরস্কার শুনিয়া উত্তেজিত হইতেন না, বরং উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন; আর তাহা হইলে শশিমুখীরও স্বামীকে মূর্খ বলিতে সাহসে কুলাইত না। স্ত্রীর তিরস্কারে এইভাবে বাড়িঘর ফেলিয়া ও স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াকে "বৈরাগ্য" বলে না, বরং উহাকে "চণ্ডালী ক্রোধ" বলা যাইতে পারে।

গোবিন্দের করচাখানি মুদ্রিত হওয়া পর্য্যন্ত উহা দীনেশবাবুর অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, "গোবিন্দদাসের করচা" লিখিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি গোবিন্দ কর্ম্মকারের ছিল কি না, ইহাই জানিবার জন্য যে তিনি এই করচা বহুবার তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; এবং আমাদের মনে হয়, সেইজন্যই গোবিন্দের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে করচায় যেখানে—প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে—যাহা পাইয়াছেন, তাহা সমস্তই যে তিনি তাঁহার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং দীনেশবাবুর

লিখিত ভূমিকা অনুসন্ধান করিয়া গোবিন্দ কর্ম্মকারের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দ সামান্য বাঙ্গালা জানিতেন। সংস্কৃত ত জানিতেনই না, এইজন্য যেখানে পাণ্ডিত্যের কথা সেখানে তিনি মূক হইয়া থাকিতেন। রামরায়ের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা শতাংশের একঅংশও তিনি লিখিতে পারেন নাই এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।" দীনেশবাবু শেষে লিখিয়াছেন,—"কর্ণামৃত মহাপ্রভু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র তত্ত্বও কি আমরা মূর্খ ভৃত্যের নিকট আশা করিতে পারি?" (৬৬)

করচার একস্থানে আছে,—"করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে।" দীনেশবাবু তাহার অর্থ করিয়াছেন যে, "গোবিন্দ লেখাপড়া জানিতেন না, এইজন্য দক্ষিণের পণ্ডিতদিগের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচারের কথা তিনি ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই। নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে যাহা পারিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন।" (৪৫)

দীনেশবাবু ভূমিকার একস্থানে বলিয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের বই-পড়া বিদ্যা সামান্যই ছিল।" (৪৭)

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—"গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে প্রভুর নিকট হইতে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিয়া রাখিতেন, কিন্তু সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই।" (৭৮)

আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—"দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিলেন। কাজেই ইহাঁদিগের মধ্যে থাকিয়া তিনি লেখনী ধারণের স্পর্দ্ধা করেন নাই, কারণ তাহার বাঙ্গালায় সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয় ছিল।" (৮০)

করচার ভাষা

দীনেশবাবু করচার ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন,—"প্রতিবাদীদের মতে গোবিন্দদাসের করচার ভাষা আধুনিক। ইঁহারা চৈতন্যচরিতামৃতকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ, ভাষাতত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, এবং এই আদর্শের আলোকে তাঁহাদের ভাষার বিচার চলিয়াছে। একথা তাঁহাদের জানা উচিত যে, চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা খাটি বাঙ্গালা নহে। কারণ কবিরাজ গোস্বামী ষোড়শবর্ষ বয়সে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং সাতাশী বৎসর বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নে নিযুক্ত হন। এই একাত্তর বৎসর এবং তাহার পরে আরও ছয় বৎসর তিনি ক্রমাগত বৃন্দাবনে থাকায় তাঁহার ভাষা হিন্দীর সঙ্গে মিশিয়া খিচুরী হইয়া গিয়াছিল।" (৪৫)

কেবল যে কবিরাজ গোস্বামী খিচুরী পাকাইয়াছেন তাহা নহে। দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"ষোড়শ শকাব্দীতে ব্রজবুলীতে বঙ্গীয় কবিরা যে সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াও অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে যে, সেই সময়ের বাঙ্গালা ভাষা বুঝি ঐরূপ ছিল। বস্তুত বাঙ্গালী কবিদের ব্রজবুলী সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা।" (৪৬)

সুতরাং সেন মহাশয়ের মতে—"চৈতন্যচরিতামৃতের 'হিন্দী-বহুল' বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলীর 'মৈথিল-মিশ্রিত' বাঙ্গালা দেখিয়া যাঁহারা ষোড়শ শকাব্দীর ভাষার আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পদে পদেই ভুল করিবেন।" (৪৭)

দীনেশবাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"যে সকল লেখক 'পণ্ডিত' তাঁহাদের লেখায় অলক্ষিত ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদির ভাষা আসিয়া পড়ে। এইজন্য

'পণ্ডিত' গ্রন্থকারদিগের ভাষায় মধ্যে মধ্যে শব্দগুলির প্রাচীন আকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোবিন্দদাসের বই-পড়া বিদ্যা সামান্যই ছিল। তিনি খাটি বাঙ্গালা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার ভাষা অতি সরল হইয়াছে।" (৪৭)

কিন্তু গোবিন্দদাসের করচার ভাষা প্রকৃতই কি অতি সরল খাটি বাঙ্গালা? দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ যাঁহার সঙ্গের সাথী, যিনি শত শতবার ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি জানেন না ইহার ভাষা কিরূপ? তবে কি করিয়া তিনি বলিলেন যে. গোবিন্দদাসের করচার ভাষা অতি সরল খাটি বাঙ্গালা?

তিনি অবশ্যই তাহা জানেন। তবে তিনি পাকা সাহিত্যিক কি না, তাই করচার ভাষা লইয়া একটু খেলা খেলিয়াছেন এই মাত্র। তিনি ইহার ভাষা সম্বন্ধে এখনই যাহা বলিলেন, পর মুহূর্ত্তে তাহার বিপরীত কথা কি করিয়া বলিবেন? কাজেই এরূপ কৌশল করিয়া বলিতে হইবে, যাহাতে সরলমতি পাঠক তাঁহার সেই ভেল্কী সহজে বুঝিতে না পারেন।

সেইজন্য প্রথমে করচার ভাষা সরল খাটি বাঙ্গালা বলিয়া, তাহার পর নানা রকম অবান্তর কথা লইয়া অনেক রকম আলোচনা করিলেন; এবং যখন বুঝিলেন যে, করচার ভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রথমে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠকের মনে সেরূপ ভাবে ছাপ দিতে পারে নাই, তখন ধীরে ধীরে বলিলেন,—"যদিও করচার লেখা অতি সরল ও সুখপাঠ্য, তথাপি ইহার ভাষায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন অনেক আছে। কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য করিলেই এ কথা প্রতীয়মান হইবে।" (৫০)

ইহাই বলিয়া করচা হইতে বহু কথা উদ্ধৃত করিলেন, তাহাদের অর্থ দিলেন, যে সকল ছত্র হইতে কথাগুলি লওয়া হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত

করিলেন, এবং যে পৃষ্ঠায় ঐ সকল ছত্র আছে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলেন। এইরূপে এক পৃষ্ঠারও অধিক স্থান জুড়িয়া লইয়া অনেকটা সময় কাটাইলেন। তারপর বলিলেন,—"প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক হিন্দী কথা পাওয়া যায়। আমি ব্রজবুলী ও চরিতামৃতের কথা বলিতেছি না। খাটি প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতেও এই সকল হিন্দী শব্দের প্রভাব দেখা যায়।" (৫১) কিন্তু কি করিয়া ইহাতে হিন্দী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই।

ইহার পর অন্যান্য কথা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন, এবং শেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন,—"করচাতেও মাঝে মাঝে ঐরূপ হিন্দী শব্দ আছে। আবার এরূপ কতকগুলি শব্দও আছে, যাহা অত্যন্ত প্রাচীন প্রয়োগ।" (৫১)

এখন দেখা যাউক করচার ভাষা সম্বন্ধে দীনেশবাবু কি বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে কোথায় আনিয়া ইহা দাঁড় করাইলেন। তিনি প্রথমে বলিলেন—

(ক) গোবিন্দদাস খাটি বাঙ্গালা কথা লিখিয়া গিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁহার ভাষা অতি সরল হইয়াছে।

তারপর বলিলেন—

(খ) যদিও করচার লেখা অতি সরল ও সুখপাঠ্য, তথাপি ইহার ভাষায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন অনেক আছে।

এবং শেষে একেবারে বলিয়া ফেলিলেন—

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় করচাতেও মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ আছে। আবার ইহাতে এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে যাহা অত্যন্ত প্রাচীন প্রয়োগ।

তিনি প্রথমে বলিলেন,—গোবিন্দদাস "খাটি বাঙ্গালা কথা" লিখিয়া-

ছেন, এবং ক্রমে বলিলেন,—ইহাতে মাঝে মাঝে "হিন্দী" ও "প্রাচীন প্রয়োগ" শব্দও আছে।

এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য—

"খাটি বাঙ্গালা কথা" তিনি কাহাকে বলিতেছেন?

"হিন্দী" ও "প্রাচীন প্রয়োগ" শব্দগুলি কি "খাটি বাঙ্গালা" কথার অন্তর্ভুক্ত?

"হিন্দী" ও "প্রাচীন প্রয়োগ" শব্দগুলি কি প্রকারে খাটি বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল?

চৈতন্যচরিতামৃতের "হিন্দী-বহুল" বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলীর "মৈথিল-মিশ্রিত" বাঙ্গালার সহিত "হিন্দী ও প্রাচীনপ্রয়োগ শব্দ মিশ্রিত" খাটি বাঙ্গালার প্রভেদ কি?

আশ্চর্য্যের বিষয় সেন মহাশয় এই সম্বন্ধে তাঁহার "ভাষাতত্ত্ব" প্রসঙ্গে কোনরূপ আলোচনাই করেন নাই! এই ভাবেই বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা করিতে হয় নাকি?

যাঁহারা 'পণ্ডিত' তাঁহাদের লেখায় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদির ভাষা ও হিন্দী প্রভৃতি শব্দ আসিয়া পড়িতে পারে, কারণ তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থাদি লইয়া সর্ব্বদা চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেন মহাশয়ের মতে—গোবিন্দ কর্ম্মকারের বই-পড়া বিদ্যা ছিল না বলিলেই হয়। তারপর তিনি সংস্কৃত আদপে ত জানিতেনই না, বাঙ্গালায়ও তাঁহার সামান্য অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল। এরূপ অবস্থায় যদিবা কখন তিনি কোন পুথি পড়িবার চেষ্টা করিতেন, তাহা পড়া তাঁহার পক্ষে যে কঠিন হইত তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন,—উহা বুঝিতে পারা ত দূরের কথা। আর যদি লিখিবার চেষ্টা করিতেন, তবে সে লেখা কথিত ভাষাতেই হইত, সাধুভাষা তাহাতে আসিতেই পারিত না।

কিন্তু 'গোবিন্দদাসের করচা' নামক যে পুস্তক লইয়া আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে সাধুভাষার ছড়াছড়ি, হিন্দী শব্দ ও ব্রজবুলিও তাহাতে অপরিষ্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে, আর ইহার ভাষায় রাঢ়দেশীয় প্রাদেশিকতার গন্ধমাত্রও নাই বলিলেই হয়। এরূপ ভাষা গোবিন্দ কর্ম্মকার শিখিলেন কোথায়? বিশেষতঃ করচায় যে সকল বেদান্ত-সম্মত উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, তাহাই বা তিনি পাইলেন কোথায়?(১)

---

(১) গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি দার্শনিক শব্দ শুনিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখা এবং যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা "অস্ত্র হাতা বেড়ি" গড়ান কামারের *কাজ নহে. নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, এই সমস্ত* কথা অশিক্ষিত কামারের দ্বারা লিখিত হওয়া অসম্ভব।

১। কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা।
না হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা॥ (পৃঃ ২৬)

প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দ গোস্বামী মহাশয়ের জানা যতটা সম্ভব, গোবিন্দের পক্ষে শুনিয়াও তাহা মনে রাখা ততটা সম্ভব নহে।

২। অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়।
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায়॥ (পৃঃ ২৮)

যখন তর্ক চলিতেছিল, তখন শ্রীচৈতন্য নিশ্চয়ই বলেন নাই যে তিনি দ্বৈতাদ্বৈত (নিম্বার্ক মত) বাদ অনুসারে তর্ক করিতেছেন। অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে (যাহা দীনেশবাবুও জানেন কি না সন্দেহ) তাহা গোবিন্দ কামার জানিতেন; তর্কের ধারা দেখিয়াই তিনি সব বুঝিয়া ফেলিলেন ও করচা করিলেন!

তাহার ন্যায় একজন পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মুর্খের পক্ষে এরূপ ভাষায় লেখা এবং এরূপ সরস সুন্দর কবিতায় রচনা করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইল, তৎ সম্বন্ধেও দীনেশবাবু একেবারে নির্ব্বাক্। শুধু তাহাই নহে, ইহা প্রমাণ করিবার, কি ইহা লইয়া আলোচনা করিবার যে কোন

৩। গোবিন্দদাস শাঙ্কর বেদান্তের প্রতিবিম্ববাদও বুঝিতেন, যথা—

(ক) এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয়।
প্রকৃতির ছায়া মাত্র বেদে ইহা কয়॥ (পৃঃ ৯)

(খ) কৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া জড়জগৎ হয়।
তার প্রতিবিম্ব স্বপ্ন বেদে ইহা কয়॥ (পৃঃ ১৭)

[স্বপ্ন প্রতিবিম্বেরও প্রতিবিম্ব।]

(গ) ঈশ্বরের ছায়াগায়া তাতে লিপ্ত নয়।
তাঁহার ইচ্ছায় জীব হয় মায়াময়॥ (পৃঃ ৫১)

[কে মায়াতে লিপ্ত নহে তাহা বলা হয় নাই, সম্ভবতঃ ঈশ্বর মায়ালিপ্ত নহেন ইহাই বলা কবির অভিপ্রায়।]

৪। যারা অবয়বে অবয়বী জ্ঞান করে।
চিরবাস করে তারা নরক ভিতরে॥ (পৃঃ ৩৬)

৫। দ্বাসুপর্ণা এ শ্রুতির মর্ম্ম যদি জান।
তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান॥ (পৃঃ ৫১)

[দুইটী পাখী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষের ডালে বসিয়া আছে। একজন ফল খাইতেছে, আর একজন দেখিতেছে। উপনিষদের এই শ্লোকটী গোবিন্দ এত সুন্দররূপে জানিতেন যে, তিনি অবলীলাক্রমে ইহার ইঙ্গিত ঐ পয়ারে করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালাদেশে এই শ্লোকটীকে জনপ্রিয় করিয়াছিলেন।]

প্রয়োজনীয়তা আছে সেরূপ ভাবও তিনি প্রকাশ করেন নাই। ইহাই নাকি প্রবীণ সাহিত্যিকের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা ?

কিন্তু সেন মহাশয় তখন ভাষাতত্ত্বের গবেষণা লইয়া বিভোর ছিলেন, অন্য কোনদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, এবং অন্য কোন কথাও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। তিনি সেই বিভোর অবস্থায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন,—"এদেশে পাড়াগেঁয়ে ভাষা ৪০০।৫০০ বৎসরে বড় বেশী তফাৎ হয় না। আর বঙ্গের নিভৃত পল্লীগুলিতে সহস্র বৎসরেও ভাষার কোন দ্রুত কিম্বা আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।" (৪৭)

এখানে সেন মহাশয় 'পাড়াগেঁয়ে ভাষা' কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ইহা কথিত ভাষা, কি লিখিত ভাষা, অথবা উভয় কথিত ও লিখিত ভাষা, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

তবে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার পিতামহকে আমি দেখিয়াছি এবং আমার পৌত্রেরাও বর্ত্তমান আছে। পিতামহের ভাষা ও প্রপিতামহের ভাষাতে বিশেষ তফাৎ ছিল না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই ছয় পুরুষে (প্রচলিত গণনানুসারে ২০০ বৎসর) ভাষার কিছু তফাৎ অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু তাহা খুব বেশী নহে।" এখানে সেন মহাশয় সম্ভবতঃ 'কথিত ভাষা'র কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহার পরেই লিখিলেন, "যদি কেহ খাটি বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করেন, তবে এখনকার ভাষা হইতে তাহার একটা বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না।" এখানে সেন মহাশয় সম্ভবতঃ 'লিখিত ভাষা'র কথা বলিতেছেন।

যাহা হউক যদি ৪।৫ শত বৎসরে পাড়াগেঁয়ে ভাষার বড় বেশী তফাৎ না হয়, তবে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, রাঢ়দেশস্থ বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কাঞ্চননগর নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গত পাঁচশত বৎসরের

মধ্যে ভাষার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যদি তাহাই হয় এবং যদি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রামবাসী গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক কোন ব্যক্তি 'গোবিন্দদাসের করচা' নামক পুস্তক রচনা করিয়া থাকেন, তবে যে ভাষায় ঐ পুস্তক রচিত হইয়াছিল, সেই ভাষা কি তখন ঐ স্থানে প্রচলিত ছিল, এবং তদবধি এখনু পর্য্যন্তও কি সেই একই ভাষা সেখানে চলিয়া আসিতেছে?

দীনেশবাবু উপরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ঐরূপই হয় বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাই কি ঠিক? করচা যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই ভাষা ঐ ক্ষুদ্র পল্লীতে কিংবা ঐ অঞ্চলে সে সময় থাকিতে পারে না, এবং এখনও নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। কারণ যে ভাষায় করচা লিখিত হইয়াছে তাহা গ্রাম্য কিংবা প্রাদেশিক ভাষা নহে,—তাহা "মার্জ্জিত লিখিত বা সাধু ভাষা"। এই করচায় এরূপ অনেক কথা ও ভাব আছে, যাহা ঐ অঞ্চলের সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা সে সময় ছিল না, এবং এখনও যে উহার অনেক কথা ও ভাব তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ করচা হইতে কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তি প্রমাণ করিতেছি, যথা—

১। বিরক্ত রামাত হয়ে জিগীষার বশী।
শুক্লবস্ত্রে কেন দাও তুই হাতে মসী॥ (পৃঃ ৩১)

২। জড়ে আর চেতনে গাঁইট লাগায়েছে।
সে খুলিতে পারে যার রজস্তম গেছে॥ (পৃঃ ১৮)

৩। সর্ব্বদা শাম্ভবী মুদ্রা নয়ন মাঝারে।
না রহিল পাপী তাপী হেরিয়া ইহারে॥" (পৃঃ ৩৭)

[শাম্ভবী মুদ্রা পদার্থটা কি ? শাস্ত্রে বা বৌদ্ধগ্রন্থে যে সমস্ত মুদ্রার কথা সাধারণতঃ পাওয়া যায়, শাম্ভবী মুদ্রা তাহার অন্যতম নহে। ইহা যোগসিদ্ধগণের অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা। অনেকেরই ইহা বুদ্ধির অগম্য। খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধগণেরই এই অবস্থা সম্ভব।]

৪। মৎসর যাহার চিত্তে সদা খেলা করে।
পিতৃপতি নিজ হস্তে তার দণ্ড করে॥ (পৃঃ ৪১)

[পিতৃপতি মানে যম—এই কথাটা শিক্ষিত পাঠককে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন দীনেশবাবুও বুঝিয়াছেন। অথচ মূর্খ গোবিন্দ কামার তাহা কি করিয়া ব্যবহার করিলেন ?]

আসল কথা এই যে, গোবিন্দ কর্ম্মকারের ন্যায় অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, করচা যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে সেই মার্জ্জিত ভাষা, এবং ইহা যে সকল বেদান্ত-সম্মত তত্ত্বকথায় পূর্ণ সেইরূপ উপদেশাবলি, সরস ও চিত্তাকর্ষক কবিতায় রচনা করা যে একেবারে অসম্ভব তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যদিচ দীনেশবাবু তাঁহার লিখিত ভূমিকার বহুস্থানে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, গোবিন্দ কর্ম্মকারের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় সামান্য অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল, বই-পড়া বিদ্যা তাহার ছিল না বলিলেই হয়, আর সংস্কৃত তাহার আদপে জানাই ছিল না ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন—"করচার প্রধান গুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের সমাবেশে চিত্র ফুটাইয়া তোলা।" (৩৮)

আবার তাহার পরেই বলিয়াছেন,—"যে সকল ঘটনা নিজের কাণ দিয়া শোনা এবং নিজের চোখ দিয়া দেখা, সেইরূপ স্বকর্ণশ্রুত এবং চাক্ষুষ কথায় করচার সমস্ত বর্ণনা সরস ও জীবন্ত হইয়াছে।" তৎপরে করচা হইতে কতকগুলি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া উল্লিখিত কথার প্রমাণ করিয়াছেন এবং

শেষে লিখিয়াছেন,—"এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনা বাস্তব রাজ্যের কথা বহিয়া আনিতেছে।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—"কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা যে করচায় আছে তাহা চোখের দেখা না হইলে লোকে লিখিতে পারে না।" (৪০)

চোখ থাকিলে দেখিতে ও কাণ থাকিলে শুনিতে সকলেই পান সত্য, কিন্তু বর্ণনা করিবার ক্ষমতা সকলেরই একভাবে না থাকিতেও পারে। তবে চেষ্টা করিলে ইহা কতক পরিমাণে অর্জ্জন করা যায় সত্য। আবার বর্ণনাশক্তি থাকিলেও সকলে চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিতে পারে না। তজ্জন্য ভাষার উপর অধিকার ও কল্পনা করিবার শক্তি থাকা বিশেষ আবশ্যক। আবার চোখে না দেখিয়াও কেহ কেহ এরূপ সুন্দর ভাবে চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিতে পারেন, যাহা বাস্তব বলিয়াই মনে হয়।

যাঁহারা কাব্য কি নবন্যাস কিংবা ঐরূপ কোন গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা আছে তাহার অধিকাংশই স্বকপোল কল্পিত,—চাক্ষুষ নহে। অথচ সেই সকল বর্ণনা এমন সুন্দর সরস ও স্বাভাবিক যে, অনেকে উহা স্বচক্ষে দেখিয়াও সেইরূপ লিখিতে পারেন না। কিন্তু দীনেশবাবু গোবিন্দ কর্ম্মকারের বিদ্যার যে দৌড় দেখাইয়াছেন, তাহাতে চোখে দেখিয়া বা কাণে শুনিয়া তাহার পক্ষে গোবিন্দদাসের করচার বর্ণিত ঘটনাগুলি ঐ ভাবে রচনা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

দীনেশবাবু বলিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময় গোবিন্দদাস যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চক্ষে না দেখিয়া অপরে কিরূপে জানিতে পারিবে?" (৪০) আমরা বলি, তাহা যদি না পারা যায়, তবে সেন মহাশয় কি করিয়া জানিলেন যে, সেগুলি অলীক নহে? তিনি যে প্রকারে উহা জানিয়াছেন, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে যে কেহ সেই ভাবে অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয় উহা জানিতে পারিবে।

দীনেশবাবু আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি বৈষ্ণব-ইতিহাস-ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের করচার অতি উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি; এমন কি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত হইতেও ঐতিহাসিক প্রামাণিকতায় করচাকে বড় মনে করিয়াছি।" (২৩) তাহার কারণও তিনি দেখাইয়াছেন। যথা—

(ক) চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি পুস্তকের সর্ব্বত্রই চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া কথায় কথায় তাঁহার দেবলীলার অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু করচার চৈতন্য নূতন আদর্শ। ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্বের কথা অতি অল্পই আছে। (২৩)

(খ) অন্যান্য পুস্তকে তাঁহাকে অলৌকিক দৈবশক্তি আরোপ করিয়া সাজাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু করচায় তাঁহার খাটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। (৮১)

গোবিন্দদাসের করচায় যে অতিপ্রাকৃত নাই তাহা নহে, তবে সেগুলি যীশুর অতিপ্রাকৃত লীলার সঙ্গে মিলিয়া যায় বলিয়া বোধহয় সেন মহাশয়ের মনে কোন সন্দেহ জাগায় নাই। খাঁটি ভারতীয় অলৌকিক কাহিনী করচায় থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই ইহা সন্দেহের চোখে দেখিতেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাধুরা স্পর্শদ্বারা রোগমুক্তি (Healing by touch) করিতেন। এখানেও দেখিতেছি গোবিন্দের পেট ফুলিয়াছিল, চৈতন্য স্পর্শ দ্বারা উহা সারাইয়া দিলেন। যথা—

১। তবে প্রভু উদরেতে হাত বুলাইলা।
অমনি উদর মোর সমান হইলা॥ (পৃঃ ১৫)

আবার যীশুর ন্যায় শ্রীচৈতন্যও অন্ধকে নয়ন দিয়াছেন। যথা—

২। বাহু পশারিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল।
প্রভুর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল॥

বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র নয়ন মেলিয়া ।
কৃতার্থ হইল অন্ধ প্রভুরে দেখিয়া ॥ (পৃঃ ৩৭)।

দীনেশবাবু যাহা বলিলেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, করচার রচয়িতা বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান-বিশারদ একজন সুপণ্ডিত। প্রকৃতই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার সুবিধার জন্য পুস্তকে যে যে বিষয় যে ভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, ঠিক সেই ভাবে গোবিন্দদাসের করচা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পল্লীগ্রামবাসী কোন অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ভাবে গ্রন্থ রচনা করা কি করিয়া সম্ভবপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সেন মহাশয়ও সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

সেন মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, গোবিন্দের উপর তাঁহার এরূপ একটা মমতা জন্মিয়াছে যে, গোবিন্দের কোন দোষই তাঁহার চোখে পড়ে না। একটি কবিতায় আছে,—"যদ্যপি সন্তান হয় অসিত বরণ; প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।" আবার গর্ভজাত কি ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা 'মানসপুত্র' আরও অধিক আদরের—অধিক প্রিয়। আপন সন্তানের দোষ তবুও কখন চোখে পড়িতে পারে, কিন্তু মানস-পুত্রের দোষ কখনই আমরা দেখিতে পাই না,—কষিত কাঞ্চনের ন্যায় ইহা সর্ব্বদাই আমাদের নিকট নির্ম্মল, সর্ব্বগুণসম্পন্ন। সুতরাং সেন মহাশয় তাঁহার মানসপুত্র গোবিন্দ কর্ম্মকারের গুণকীর্ত্তনে একেবারে তন্ময় হইবেন—তাহার কোন দোষ তিনি চোখ থাকিতেও দেখিতে পাইবেন না, কাণ থাকিতেও শুনিতে পাইবেন না, মুখ থাকিতেও বলিতে পারিবেন না, আর হাত থাকিতেও লিখিতে পারিবেন না,—ইহা আর বেশী কথা কি ?

এই দেখুন না, গোবিন্দ কর্ম্মকার যদিও ষোড়শ শতাব্দীর পাড়াগেঁয়ে

অশিক্ষিত লোক, তবুও গোবিন্দ কর্ম্মকার সেন মহাশয়ের মানসপুত্র, তাঁহার আপন হাতে গড়া এবং তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়া আছে, কাজেই সেনমহাশয় তাহার কোন দোষ দেখিতে পান না, তাহার গুণেই মোহিত হইয়া আছেন।

তিনিও লিখিয়াছেন,—"যদিও এই ভূমিকায় আমরা করচার প্রামাণিকতা দেখাইতে যাইয়া বিবিধ বাহিরের প্রমাণ দিয়াছি, তথাপি আমার নিকট এই সকল প্রমাণের কোনই দরকার নাই। যেরূপ অগ্নির সম্মুখীন হইলে চক্ষু বুজিয়া তাপ দ্বারাই অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়, এই পুস্তকের অপূর্ব্ব প্রেম-মাদকতাই আমার নিকট ইহার প্রামাণিকতার বড় সাক্ষী। মহাপ্রভুর প্রাণমাতান যে দেবচিত্র গোবিন্দ আঁকিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রধান সাক্ষী। যে ভৌগোলিক চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রধান সাক্ষী।" (৮২)

এই প্রকার আবেগময়ী উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় সেন মহাশয় তাঁহার মানস পুত্র গোবিন্দ কামারের ও তাহার রচিত করচার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকের আলেখ্য সেই অলোক-সামান্য দ্যুলোকের বার্ত্তাবহী প্রেম-দেবতার আলোক-চিত্র,—উহা কেহ পাণ্ডিত্যের দ্বারা, ভক্তিদ্বারা, বা স্বকপোল-কল্পনা দ্বারা আঁকিতে পারিবেন না।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেন মহাশয় গোবিন্দের গুণে এতই মুগ্ধ যে তাহার কোন দোষ তাঁহার চক্ষে পড়ে না। এই দেখুন, গোবিন্দদাস প্রদত্ত ভৌগোলিক চিত্র যে সব স্থানেই খাটি তাহা নহে; তবে তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও সেন মহাশয় একেবারেই হারাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রায় রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া প্রভু ত্রিমন্দনগরে প্রবেশ করিলেন। ত্রিমন্দ উত্তর-আর্কট জেলায়। তথা হইতে তিনি পদ্মগুহা, এবং পদ্মগুহা হইতে সিদ্ধ বা অক্ষয় বটেশ্বরে আসিলেন। এই বটেশ্বর

উত্তর-আর্কট জেলার উত্তরে কাড্ডাপা জেলায় অবস্থিত। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রভু দক্ষিণদিক যাইতে যাইতে আবার অনেকটা উত্তর দিকে চলিয়া আসিলেন। তৎপরে আরও উত্তরে নেলোর জেলার বেঙ্কট-নগরে গেলেন। তৎপরে নেলোর জেলা হইতে আবার অনেকটা দক্ষিণে আসিয়া তাঞ্জোর অথবা দক্ষিণ-আর্কট জেলার ত্রিপদী বা তৃপদী নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। আবার দক্ষিণের তৃপদী হইতে পুনরায় উত্তরে আসিয়া কৃষ্ণা নদীর নিকটবর্ত্তী গণ্টুর জেলার পান্নানরসিংহ দর্শন করিলেন। প্রেমের আবেগেও কেহ উত্তর দক্ষিণে এইরূপে মাকুর মতন ঘোরা-ফেরা করেন না।

যাহা হউক সেন মহাশয় যাহা বলিলেন উহা তাঁহার নিকট যে বর্ণে বর্ণে 'খাটি সত্য' তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ গোবিন্দ কর্ম্মকার যাহা আঁকিয়াছেন, তাহা পাণ্ডিত্যের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা বা স্বকপোল কল্পনা দ্বারা,—এক কথায় কোন কিছুর দ্বারা কেহই আঁকিতে পারিবে না। কিন্তু কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—তবে গোবিন্দ কর্ম্মকার উহা আঁকিলেন কি করিয়া?" ইহার উত্তর আমরাই দিতেছি,—"গোবিন্দ কর্ম্মকার হইতেছেন সেন মহাশয়ের 'মানসপুত্র'। সেইজন্য অপর সকলের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব, তাহা গোবিন্দ কামারের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে—কেবলমাত্র সেন মহাশয়ের নিকট।

কিন্তু একথা সেন মহাশয় ভিন্ন অপর সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবিন্দ কর্ম্মকার ষোড়শ শতাব্দীর পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোক হইলে, তাহার পক্ষে,—বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা-বিজ্ঞান-বিশারদ-পণ্ডিতের ন্যায়, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার সুবিধার জন্য, যে ভাবে যে যে বিষয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন,—ঠিক সেইভাবে "গোবিন্দদাসের করচা" নামক গ্রন্থের

ন্যায় কোন পুস্তক রচনা করা একেবারেই অসম্ভব। এখন কথা হইতেছে, যদি গোবিন্দ কর্ম্মকার কিংবা তাহার ন্যায় কোন ব্যক্তি করচা-রচক না হন, তবে তিনি কে? সেই কথা আমরা পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

জয়গোপাল গোস্বামী ?

গোবিন্দদাসের করচার কথা বলিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় জয়-গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। কারণ এই করচাখানি লোকচক্ষুর গোচরে তিনিই প্রথমে আনয়ন করেন। তাহার পূর্ব্বে এই করচার কথা কেহ যে জানিতেন তাহার প্রমাণাভাব। তবে এই করচার কথা যে কোন গ্রন্থেই নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

গোস্বামি মহাশয় যখন এই করচা সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করেন, তখন তিনি কোথায় ইহা পাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহাকেও পরিস্কার ভাবে কোন কথা বলেন নাই। তবে তাঁহার কথার ভাবে বোঝা গিয়াছিল যে, গোবিন্দদাসের করচার পাণ্ডুলিপি তাঁহার কাছেই ছিল।

শিশিরবাবুর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয় ছিল না। তবে তিনি শুনিয়াছিলেন যে শিশিরবাবু গৌরভক্ত। সেইজন্য রাণাঘাটনিবাসী ৺যজ্ঞেশ্বর ঘোষ মহাশয় দ্বারা তাঁহার নিকট করচার গোড়ার কতকাংশের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার অভিমত গ্রহণ করা। শিশিরবাবু ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করেন, এবং ইহা হারাইয়া যাইবার পর গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

করচা মুদ্রিত হইবার পরই মতিবাবু ইহার যে সমালোচনা করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এই করচার হস্তলিখিত পুথি কেবলমাত্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকটই ছিল।" তিনি আরও লেখেন,—"তাঁহাদের

দেখা সাক্ষাৎ হইবার পর, নষ্টপত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, পত্রগুলি কাহারও না কাহারও হস্তগত হইয়া থাকিবে, সুতরাং ইহার পুনরুদ্ধারের আশা করিবার কারণও ছিল। যেহেতু গোবিন্দদাসের করচা সম্বন্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা প্রভৃতি কাগজে আন্দোলন হওয়ায়, অনেকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। আর, গোস্বামী মহাশয়ও এরূপ আশা করিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহাদের ঘরে এই গ্রন্থ রহিয়াছে, তখন উহার নকল কোন আখড়ায় বা কোন বৈষ্ণবগৃহে থাকিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক করচাখানি শেষে ছাপানই সাব্যস্ত হয়।"

মতিবাবু আরও লিখিয়াছেন যে,—গোবিন্দদাসের করচা ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়া গোস্বামী মহাশয় একদিন আসিয়া বলেন যে, হারাণো পাতাগুলির নকল পাওয়া গিয়াছে, তবে উহা ঠিক কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। গোস্বামী মহাশয় আরও বলেন যে,—তাঁহার বাসনা পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত না হয়। এইজন্য ঐ নকল পত্রগুলি সহ তিনি পুস্তকখানি ছাপিতে সংকল্প করিয়াছেন। কারণ—নকলটি প্রকৃতই যদি অলীক হয়, তবে উহা প্রকাশিত হইলে কেহ না কেহ উহা ধরিয়া দিবেন, এবং এইরূপে আসলটুকু বাহির হইয়া পড়িবে।

সমালোচনাটি যখন বাহির হয় তখন গোস্বামী মহাশয় জীবিত ছিলেন। সুতরাং উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা ঠিক না হইলে তিনি ভুল দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যাহা হউক, গোস্বামী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন শিশিরবাবুরা তাহাই তখন বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু শিশিরবাবুর সহিত গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইবার পরে এবং পুস্তক ছাপা হইবার পূর্ব্বে, গোস্বামী মহাশয় একদিন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রিয়ছাত্র ও তৎকালিক ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বরবাবুকে

বলেন,—"মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কবিতায় লিখিত একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। তুমি তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয় আনন্দলাভ করিবে।" বিশ্বেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন,—"আমি অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া এই পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলাম। ইহাই গোবিন্দদাসের করচা। ইহার সমস্তই পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তাক্ষর। প্রথম কতকগুলি পাতার অভাবে পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ ছিল।"

বিশ্বেশ্বরবাবু ইহার পরে একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আজকাল বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। আপনার পুস্তকে মহাপ্রভুর চরিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সময় যদি আপনি পুস্তক খানি মুদ্রিত করেন, তবে বৈষ্ণবগণ ও মহাপ্রভুর ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ উহা অতি আদরের সহিত পাঠ করিবেন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"পাণ্ডুলিপিখানি কিছুদিন হইতে অসম্পূর্ণ ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। স্কুল ইনেস্পেক্টর আফিশের হেডক্লার্ক যজ্ঞেশ্বর ঘোষকে উহা পাঠ করিতে দিয়াছিলাম, তিনি উহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।"

ইহার উত্তরে বিশ্বেশ্বরবাবু বলিলেন,—"সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানি যখন আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তখন ইহার কিয়দংশ যদি আপনি রচনা করিয়া দেন তাহাতে ক্ষতি কি?" পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রিয়ছাত্রের এই কথার উত্তরে তখন কিছুই বলিলেন না।

যাহা হউক মতিবাবুর লিখিত সমালোচনা এবং বিশ্বেশ্বরবাবুর লিখিত বিবরণ মিলাইয়া পাঠ করিয়া করচার পাণ্ডুলিপির একটা ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গোবিন্দদাসের করচার যে পাণ্ডুলিপি ছিল, তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার হস্তাক্ষর। ইহার

গোড়ার ২।৩ ফর্ম্মার পাণ্ডুলিপি শিশিরবাবুর হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহা হারাইয়া যাইবার পর করচার পাণ্ডুলিপির অবশিষ্টাংশ গোস্বামী মহাশয় শিশিরবাবুকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন, এবং তাহাই তিনি বিশ্বেশ্বরবাবুকে পরে পড়িতে দেন।

ইহা হইতে আমরা আরও জানিতে পারিতেছি যে, শিশিরবাবু ও গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে করচা মুদ্রিত করা সাব্যস্ত হইবার পর, গোস্বামী মহাশয় একদিন আসিয়া শিশিরবাবুদের নিকট বলেন যে, নষ্টপত্র গুলির একটা নকল তাঁহার হস্তগত হইয়াছে ; তবে তাহা অলীক কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। আসল কথা এই যে, বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত গোস্বামী মহাশয়ের করচা ছাপা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবার পর, একদিন গোস্বামী মহাশয় আসিয়া বলিলেন,—"বিশ্বেশ্বর, করচা সম্পূর্ণ হইয়াছে, উহা ছাপিতে দিয়াছি। শীঘ্রই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত পুস্তকাকারে দেখিতে পাইবে।" বিশ্বেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন, পুস্তক মুদ্রিত হইলে, পাণ্ডুলিপির মৌলিক অংশ এবং পরে সংযোজিত অংশ তুলনা করিয়া উভয় অংশই একজনের রচনা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। বস্তুতঃই মুদ্রিত পুস্তক-খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেও কেহই বলিতে পারিবেন না উহার কোন্ অংশ গোস্বামী মহাশয় পরে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তবে শিশিরবাবুকে প্রথমে গোড়ার যে অংশ পাঠ করিতে দেওয়া হয়, তাহার সহিত পরে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পার্থক্য ছিল, এবং সেইজন্যই শিশিরবাবু মুদ্রিত পুস্তকের ঐ অংশ অলীক বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, এইরূপ হইবে তাহা জানিয়াই গোস্বামী মহাশয় শিশির-বাবুকে পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়াছিলেন যে, নষ্ট অংশের নকল যাহা তিনি পাইয়াছেন তাহা অলীক কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

যাহাহউক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গোবিন্দদাসের করচার যে

পাণ্ডুলিপি ছিল, তাহা সমস্তই যে তাঁহার নিজের হাতের লেখা তাহা প্রামাণিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, উহা তাঁহার নিজের রচিত, না কোন প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা। গোস্বামী মহাশয় বিশ্বেশ্বর-বাবুকে বলেন,—"মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কবিতায় লিখিত একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে।" উহা কোন পুথি হইতে নকল করা কি না সে কথা বিশ্বেশ্বরবাবুকে তিনি কোনদিন বলেন নাই। আর ইহার পূর্ব্বে শিশিরবাবুর সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহাকেও বলেন নাই যে, ইহা তিনি কোন প্রাচীন পুথি হইতে নকল করিয়াছেন কি না।

উল্লিখিত ঘটনার পর, একদিন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "অনুক্রমণিকা" নামক একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ স্কুলের পাঠ্যপুস্তক করিবার জন্য স্বর্গীয় রসময় মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করিতে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। রসময়বাবু তখন হেয়ারস্কুলের হেডমাষ্টার। কথা প্রসঙ্গে তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"করচা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি আমাকে বলুন ত? ঐ সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।" ইহার পূর্ব্বে আর কেহই বোধহয় এই ভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন নাই। কাজেই রসময়বাবুর এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন,—"ভাই, হা ভাই, বইখানা আমার কাছে ছিল, শিশিরবাবুদের পড়িতে দিয়াছিলাম। অনেকগুলা পাতা হারায়ে যাওয়ায় সে গুলা রচনা করে দেওয়া হয়েছে।" এই কথা শুনিয়াই রসময়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নষ্টপত্র গুলি কি আপনিই রচনা করে দিয়াছিলেন?"

রসময়বাবু বাহিরের লোক। তাঁহার সহিত গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্বে আর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই; আর তিনি কি প্রকৃতির লোক গোস্বামী মহাশয় তাহাও জানিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার নিকট নিজের স্বার্থ

সাধনের জন্য আসিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া, অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় সম্ভবতঃ তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে এই সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ করচা সম্বন্ধে রসময়বাবু পাছে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, এই আশঙ্কায় আর সেখানে থাকিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

বিশ্বেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন,—"পণ্ডিত মহাশয়ের পরলোকগমনের কিছু পূর্ব্বে একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—করচার রচয়িতা কে?" বিশ্বেশ্বরবাবু তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেও, এক সময় তাঁহার শুধু ছাত্র নহেন, অতি প্রিয়ছাত্র ছিলেন, এবং পাঠ্যাবস্থা হইতে তখন পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ তাঁহাকে সমভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা ও মান্য করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহাকে সেই চক্ষে দেখিতেন।

কাজেই বিশ্বেশ্বরবাবুর ঐ প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় অনভ্যস্ততা-বশতঃ একটু বিচলিত হইলেন। ইহা ঠিক ভীত হইয়া নহে, সম্ভবতঃ কতকটা অপমান বোধ করিয়া। কারণ, তাঁহার ছাত্র হইয়া তাঁহারই মুখের উপর কিনা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে! তাই কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া, শেষে বিরক্তির সহিত গম্ভীরভাবে বলিলেন যে,—রাঢ়দেশের এক শিষ্যের নিকট তিনি উহা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস,—পণ্ডিত মহাশয়ই ঐ করচার রচয়িতা। সেইজন্য শিষ্যের নাম ধাম এবং সেই পুথির গতি কি হইল ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া, তিনি একেবারে বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার কিন্তু বিশ্বাস উহা আপনারই রচিত।" বিশ্বেশ্বরবাবু যে এরূপ কথা তাঁহার মুখের উপর বলিতে পারেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও

অগোচর। কাজেই হঠাৎ বিশ্বেশ্বরবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল, মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। তিনি মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব দেখাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং বিশ্বেশ্বরবাবু আর কোন কথা বলা সমীচীন নহে ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিশ্বেশ্বরবাবুর ঐ প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন গোস্বামী মহাশয়ের নাতজামাই কীর্ত্তীশবাবু দাদাশ্বশুরকে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি ধীরভাবেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"বর্দ্ধমান জেলার কোন শিষ্যের বাড়ীতে তিনি একখানি প্রাচীন কীটদষ্ট পাঠদুষ্ট জীর্ণ পুথি পাইয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল।" আবার তাঁহার সমবয়স্ক এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একদিন কথা প্রসঙ্গে যখন করচার কথা তুলিলেন, তখন গোস্বামী মহাশয় সগৌরবে প্রফুল্লচিত্তে বলিয়াছিলেন,—"আরে ভায়া, কিছুকাল চুপ করিয়া থাক, একশো বছর পরে ইহাই ইতিহাস হইয়া যাইবে।" সেখানে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ২।৩ জনের নিকটও এই কথা শুনা গিয়াছে।

যাহাহউক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় চল্লিশ বৎসরকাল স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একত্রে কাটাইয়াছিলেন। শৈশবে তিনি তাঁহার পণ্ডিত মহাশয়ের অতি প্রিয়ছাত্র ছিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়কে প্রকৃতই গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও মান্য করিতেন। শেষে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, গোস্বামী মহাশয় যতদিন জীবিতছিলেন, ততদিন তাঁহার সহিত একত্রে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরে ভালবাসা ও সদ্ভাব ছিল। সুতরাং গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে তিনি যতটা

জানিতেন, ততটা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট-আত্মীয়,—এমন কি তাঁহার পুত্রেরা পর্য্যন্তও—পরিজ্ঞাত ছিলেন না। বিশ্বেশ্বরবাবুও লিখিয়াছেন যে, নানা কারণে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া ছিল যে, গোবিন্দদাসের করচা খানি স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়েরই রচিত। যে সকল কারণে তাঁহার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেই গুলি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় লিখিয়াছেন,—"যে সকল কারণে আমি গোবিন্দদাসের করচা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত বলিয়াই বিশ্বাস করি, সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। যথা—

(১) পণ্ডিত মহাশয় করচার যে পাণ্ডুলিপি আমাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন তাহা সমস্তই তাঁহার নিজের হস্তলিখিত। এই হস্তাক্ষর আমার সুপরিচিত ছিল। পাণ্ডুলিপি প্রদানকালে উহা যে কোনও প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা হইয়াছে, একথা তিনি আমাকে আদপে বলেন নাই। তখন ঐ করচার নামগন্ধও কেহ জানিতেন না,—উহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা ত দূরের কথা। কাজেই উহা কোন প্রাচীন পুথির নকল হইলে সে কথা আমাকে বলিবার কোন আপত্তি পণ্ডিত মহাশয়ের থাকিতে পারে না।

(২) আমি যখন পাণ্ডুলিপির লুপ্ত কয়েক পৃষ্ঠা পণ্ডিত মহাশয়কে রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করি, তখন তিনি কোনই আপত্তি করেন নাই, কিংবা ঘুণাক্ষরেও আমাকে বলেন নাই যে, অপরের রচিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি কিরূপে নিজের রচিত বিষয় সংযোজিত করিবেন।

(৩) লুপ্ত কয়েক পৃষ্ঠা কিরূপে সংশোধিত হইল সে কথাও তিনি আমাকে বলেন নাই।

(৪) প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার ভার লইয়া পণ্ডিত মহাশয় কেন যে উহার ভূমিকা লিখিলেন না, এই কথা সর্ব্বদাই আমার মনে হইত। পণ্ডিত মহাশয় তৎকালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি গণিত বিজ্ঞান হইতে কাব্য দর্শন প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলে তাহার যে একটি সমীচীন ভূমিকা লেখা আবশ্যক তাহা পণ্ডিত মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। তথাপি গোবিন্দ-দাসের করচার ভূমিকা পণ্ডিত মহাশয় কেন লিখিলেন না, ইহা বিশেষরূপে আলোচনা করিবার যোগ্য। আজকাল অনেকে করচার মূল পাণ্ডুলিপি দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু করচার প্রথম সংস্করণে পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কোন ভূমিকা কেন লিখিলেন না, ইহার হেতু কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

(৫) করচার আদর্শ প্রাচীন পুথি পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কখনও দেখি নাই এবং উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাও পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে করচার মুদ্রণকালে কিম্বা অন্য কোন সময়ও শুনি নাই।

তাহার পর internal evidence বা পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ের কথা। এই প্রমাণসমূহ যে কোন বিচারক্ষম চিন্তাশীল ব্যক্তির বোধগম্য নিশ্চয় হইবে।

(৬) করচার মৌলিক অংশ ও পরে সংযোজিত নূতন অংশের ভাষা ও ভঙ্গি একই প্রকার।

(৭) কবিতাগুলিতে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি প্রাচীন শব্দ থাকিলেও অধিকাংশ কবিতা আধুনিক ভাবেই রচিত।

(৮) সোমনাথ-বিগ্রহের ধ্বংশবশতঃ মহাপ্রভুর আক্ষেপ আধুনিক ইতিহাস-পাঠকের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়।

(৯) হরিনাম-বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভুর স্ত্রীদেহ-আলিঙ্গন আধুনিক কবির কল্পিত।

(১০) পুস্তকে নিবদ্ধ বহু বহু উপদেশ আধুনিক ভাবেই রচিত।

পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রন্থকর্তৃত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ বলিয়া যাহা আমার মনে হয়, সে সকল নিম্নে দেখাইতেছি। যথা—

(১১) করচা নিবদ্ধ বৈদান্তসম্মত উপদেশাবলী পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে মৌখিকভাবেও অনেক সময় শুনাইতেন।

(১২) বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালেও পণ্ডিত মহাশয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক গল্প বা প্রসঙ্গ করিতেন। তাহাতে মনে হইত মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী লইয়া তিনি বিশেষভাবে মগ্ন থাকিতেন।

(১৩) ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক তত্ত্ব সকল অবগত হইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা কৌতুহল ছিল। তিনি অনেক সময়ে ভূচিত্র বা ম্যাপ লইয়া একাগ্রচিত্তে উহা দর্শন করিতেন। তাঁহার 'চরিত গাথা' নামক কবিতা পুস্তকে 'ভূচিত্র' নামে একটি কবিতা আছে। এরূপ কবিতা আর কোন কবির পুস্তকে প্রায় দেখা যায় না।

(১৪) কোন ভ্রমণকারী বা নূতন লোক দেখিলেই পণ্ডিত মহাশয় তাহার মুখে কোন নূতন কথা শুনিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে সংগৃহীত তত্ত্বসকল করচায় বর্ণিত মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ-বর্ণনায় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

(১৫) পণ্ডিত মহাশয় সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। 'চারুগাথা' ব্যতীত আমি পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত অন্যান্য অনেক কবিতা পাঠ করিয়াছি। সেগুলি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

(১৬) বাল-স্বভাব-হেতু পণ্ডিত মহাশয় কখন কখন অদ্ভুত বা আজ-গুবি বিষয়ের অবতারণা করিতে ভালবাসিতেন। তাই বোধহয়, মহাপ্রভুর

দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গী 'গোবিন্দ' সাজিয়া তাঁহার কড়চা-গ্রন্থের নায়করূপে আবির্ভাব।

(১৭) হরিনাম প্রচার তাঁহার বংশগত বৃত্তি বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় জীবহিতার্থ 'কড়চা' রচনা করিয়াছিলেন। লোক প্রবঞ্চনা করা বা বাহাদুরী লইবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না।

বিশ্বেশ্বরবাবু উল্লিখিত কারণগুলি সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়কে লোকচক্ষুর গোচরে হীন ও হেয় করা তাঁহার অভিপ্রেত আদপেই থাকিতে পারে না। পাছে কাহারও মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হয়, সেইজন্য তিনি লিখিয়াছেন,—"উপসংহারে আমার অবশ্য বক্তব্য যে, পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয় বালকের ন্যায় সরলভাবাপন্ন এবং কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ রসজ্ঞ-পণ্ডিত ছিলেন।...মহাপ্রভুর প্রতিও তিনি যথেষ্ট ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার স্বলিখিত কথকতার পুথিতেও তিনি মহাপ্রভুর লীলার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ফলতঃ বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের উপদেশানুসারে তিনি মহাপ্রভুকে আদর্শস্থানীয় প্রতিপন্ন করিতেই বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।"

বিশ্বেশ্বরবাবু শেষে লিখিয়াছেন,—"আধুনিক সুবিজ্ঞ সমালোচক-গণের বিচারে পুস্তকের কোনস্থলে মহাপ্রভুর চরিত্রকে যদি তিনি হীন বা কলঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে,—ভাবপ্রবণতা ও অনবধানতাবশতঃই উহা ঘটিয়া থাকিবে।"

পরিশিষ্ট

স্বধামপ্রাপ্ত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয় লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাস কর্ম্মকার নামে কোন লোক প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আর যিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন, প্রভুর প্রেমোন্মাদে তিনিও প্রমত্ত হইয়াই থাকিতেন। তিনি যে সে সময় কবিতা করিয়া গ্রন্থ লিখিবেন, এমন অবকাশ তাঁহার থাকিত না। প্রভুর উপকরণ কৌপীন, কন্থা, কমণ্ডলু ও আসনাদি বহন করিয়া যিনি সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন, তিনি কালি কলম কাগজ সংগ্রহ করিয়া কবিতা রচনা করিয়া পুস্তক লিখিবার সময় কিরূপে পাইতেন? অতএব মনে হয়, *গোবিন্দদাসের করচা* নামক পুঁথি আধুনিক ও কল্পিত। কারণ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৪১০ বৎসর পরে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ৪১০ বৎসরের মধ্যে কত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি ও জ্ঞানীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাকে মাতৃগর্ভ হইতে প্রকট করিতে পারিলেন না। ইনি ৪১০ বৎসর মাতৃগর্ভেই ছিলেন। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ দৈত্যরাজ দুইটি ১০০ বৎসর মাত্র মাতৃগর্ভে থাকিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই দেবগণ বিশঙ্কিত ও ত্রিভুবন কম্পিত হইয়াছিল। যিনি ৪১০ বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিষয় আর কি বলিতে পারা যায়।"

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দদাসের করচা উদ্ধারের

যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মই সুসম্পন্ন হইয়াছে। পিতৃভক্ত পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভূমিকায় যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, আমি সেই সকল ঘটনার মূল সত্য বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ কালিদাস নাথ মহাশয় সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি যখন আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম, তখন উক্ত নাথ মহাশয় আমার সহকারী ছিলেন এবং তাহারও পূর্ব্বে তিনি ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরিচালিত মাসিক-বিষ্ণুপ্রিয়া অফিসে কার্য্য করিতেন। আমি যখন সর্ব্বপ্রথমে আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় আলোচিত করচার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন কালিদাস নাথ মহাশয়ের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমার পরামর্শও হইয়াছিল। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ও তখন প্রায়শঃই আমাদের অফিসে আগমন করিতেন। কেননা আমার পূর্ব্বে তিনি ও শান্তিপুরনিবাসী পরলোকপ্রাপ্ত রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় মাসিক বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উক্ত নাথ মহাশয় একদিনের তরেও আমাদিগকে এই কথা বলেন নাই যে, তিনি বৈষ্ণবগ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি বহুস্থানে অনুসন্ধান করিলেও গোবিন্দদাসের করচার পাণ্ডুলিপি তিনি কুত্রাপি দেখিয়াছেন। প্রত্যুত উহা যে ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের গৃহেই জাত বা আবিষ্কৃত, তাঁহার সঙ্গে আলাপে এই ধারণাই আমাদের মনে জন্মিয়াছিল।

বিশেষতঃ কালিদাস নাথ মহাশয় বহুকাল পর্য্যন্ত বাগবাজারে ঘোষ মহাশয়দের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিলেন। যদি করচার প্রথম-প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানা তাঁহা দ্বারাই সংগৃহীত হইত এবং কোথা হইতে তিনি

উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে স্থান যদি তাঁহার জানা থাকিত, তবে উক্ত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ঘোষ মহাশয়গণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেন না, এবং উহা মুদ্রণ করার জন্য যদি তাঁহাদের বাসনা থাকিত, তবে সহজেই তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারিত। এই সকল কারণে বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের এই কথাগুলি একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পূজ্যপাদ শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় অমিয়-নিমাই-চরিত বর্ণনে করচা অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং ঐ করচা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো কোন সন্দেহ হয় নাই। শিশিরবাবুর লিপিনৈপুণ্যে ঐ করচার কোন কোন ঘটনা অমিয়-নিমাই-চরিতে উজ্জ্বল স্থান পাইয়াছে। আমার রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্মগৌরব' পুস্তকে কোন কোন ঘটনা সুন্দর বোধে লিপিবদ্ধ করি। শুধু আমি নই, শিশিরবাবুর অনুকরণে আরও কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের লিখায় করচা অবলম্বন করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয়ের লিখিত "গোবিন্দদাসের করচা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে অমৃতবাবু মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের তীর্থসমূহ বহু পরিশ্রমে অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচার লেখক দক্ষিণের তীর্থসমূহের যে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া গ্রহণ করা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'নব্যভারত' পত্রিকায় বৈষ্ণবসাহিত্যক্ষেত্রে অন্যূন ২৫ খানি অনৈতিহাসিক ও আধুনিক

কৃত্রিম গ্রন্থের তালিকা প্রদান করেন। এই তালিকার মধ্যে গোবিন্দ-দাসের করচাও ধৃত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃতের ১ম সংস্করণে ঢাকার তাৎকালীন স্কুলইন্‌স্পেক্টর মিঃ ষ্টেপিল্টন (Stapleton) সাহেব একটি বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করেন। তাহাতে তিনি লিখেন যে, বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ রাধারমণ ঘোষ মহাশয় গোবিন্দদাসের করচা চৈতন্যদেবের কোন ভৃত্য কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া স্বীকার করেন না।

"মধ্যযুগের বাঙ্গালা" লেখক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের করচায় নবীনত্বের গন্ধ সুস্পষ্ট।"